ডাক দিয়ে যাই

নবেন্দু ঘোষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২ ॥

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫২

তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৩

চতুর্থ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

পঞ্চম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৯

ষষ্ঠ সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

নিবেদন

১৩৪৮ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত 'প্রভাতীতে' ধারাবাহিক ভাবে এই উপন্যাস 'ভগ্নস্তূপ' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম দিকে কতকগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস রচিত। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি বা আধুনিক সমাজ ও সভ্যতাকে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের মধ্যে যে যোগসূত্রতা নেই এবং পুরাতন রীতিনীতির জগদ্দল পাথরে যে এবার আঘাত লেগেছে এবং দিতে হবে—তাই বলতে আমি চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার সাফল্যের মাপকাঠি আমার হাতে নাই, তা পাঠকদের হাতে।

এই পুস্তক রচনার সময় 'বেহার হেরাল্ড' ও 'প্রভাতী'র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র সমাদ্দার সহানুভূতি ও উপদেশ দিয়ে আমায় যে সাহায্য করেছেন তা ভুলবার নয়।

বই প্রকাশ সম্বন্ধে দুজনের নাম করতেই হবে। প্রথম শ্রীমান রঞ্জিৎ সিংহ (রঞ্জিৎ ভাই), দ্বিতীয় সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোজ বসু। এদের কাছে আমি ঋণী থাকব।

বেঙ্গল পেপার মিল্‌সের শ্রীযুক্ত প্রতাপ কুমার সিংহ মহাশয়ের আনুকূল্যে এই বইয়ের কাগজ সংগৃহীত হয়েছে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

গ্রন্থকার

পাটনা

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

এই লেখকের অন্যান্য বই

নায়ক ও লেখক (উপন্যাস)

মানুষ (গল্প)

এই সীমান্তে (গল্প)

প্রান্তরের গান (উপন্যাস)

কালো রক্ত (উপন্যাস)

পোস্ট-মার্টেম (গল্প)

ফিয়ার্স লেন (উপন্যাস)

পৃথিবী সবার (উপন্যাস)

কাঞ্চনপুরের ছেলে (উপন্যাস)

ইস্পাত (গল্প)

লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন ও ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীটার অর্ধাংশের উপর আবার সেই কোটী কোটী বৎসরের বহু পুরাতন সূর্যটার আলো পড়িল। রক্তবর্ণ অগ্নিগোলকের প্রাতঃকালীন স্বর্ণরশ্মিরেখায় নবীন জীবনের স্বপ্ন।

মহানগরীর তন্দ্রা ভাঙে। গত রজনীর অন্ধকার ও আশ্লেষক্ষিপ্ত মত্ত বিহারের স্বপ্ন তাহার চক্ষে, দেহে তাহার আলস্যমদির অনুভূতি।

সময় কাটে। মহানগরীর জড়তা ধীরে ধীরে কাটে, ধীরে ধীরে তাহার শিরার স্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বেলা বাড়ে।

সংকীর্ণ গলির মোড়ে অবস্থিত ভাঙা একতলা বাড়িটার জানালার ধারে বসিয়া গোরা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল যে সামনের বাড়ির দেওয়াল হইতে সূর্যের আলো ক্রমশ রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার সে বাবার দিকে চাহিল।

ভাঙা চেয়ারটায় বসিয়া ভবনাথ চোখ বুঁজিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

গোরা ভিতরে ঢুকিতেই তক্তাপোশের উপর হইতে উমা ডাকিয়া বলিল—"গোবা ভাই, এক গেলাস জল দে তো, ভারি তেষ্টা পেয়েছে।"

গোরা নিরুত্তরে রান্নাঘরে ঢুকিল। মা তরকারি কুটিতেছে।

এক গ্লাস জল লইয়া সে দিদিকে দিল।

খানিকটা জল পান করিয়া উমা বলিল, "গেলাসটা এখানে রেখে তুই যা—"

গোরা আবার রন্নাঘরে গেল।

কল্যাণী তরকারি কোটা থামাইয়া প্রশ্ন করিল, "কে জল চাইলে রে গোরা?"

গোরা হাত নাড়িয়া যথাসাধ্য উত্তর দিল—"আঃ—আঃ—"

"বাবা?"

গোরা মাথা নাড়িল। না।

"উমা ?"

গোরা আবার মাথা নাড়িল। হঁ্যা। গোরা জন্মাবধি মূক।

"সে কি! এই সকালবেলায় খালি পেটে ঠাণ্ডা জল খেল কেন আবার? বার্লি তো চড়ান হয়েছে—" কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হইল। মেয়েটার আট দিন যাবৎ জ্বর হয়েছে, অথচ একটু দুধও বার্লির সাথে মিশিয়ে দেবাব ক্ষমতা তার নেই। চিন্তা করিতে করিতে দুঃখে কল্যাণীর মুখ কালো ও কঠিন হইয়া উঠিল। অদৃষ্ট, কি করব আমি, অদৃষ্ট। পূর্বজন্মের দোষে যেমন আমার ভাঙা ঘরে এসেছে, দুঃখভোগ করে মরুক।

গোরা মাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ছল খুঁজিতে থাকে কেমন করিয়া সে মাকে আকৃষ্ট করিবে। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। মাকে, বাবাকে, দাদাদেব, দিদিকে—প্রত্যেককে সে ভয় করে, সকলকেই সে সর্বদা সতর্কভাবে এড়াইয়া চলে। সর্বদাই নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া সে আড়ালে আড়ালে সময় কাটায়, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই তাহার মনে একটি নিদারুণ লজ্জা পীড়াদায়ক দুস্বপ্নের মতো আত্মবিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সে জানে, সে মূক।

কেবল যখন তাহার ক্ষুধা পায়, তখনই সে যাচিয়া নিজেকে সকলেব সম্মুখে উপস্থিত করে। যখন ক্ষুধার জ্বালা তাহার পেটের মধ্যে সাপের উগ্র বিষের মতো বিসর্পিল গতিতে চলাফেরা আরম্ভ করিয়া দেয় তখন তাহার ঐ লজ্জা, ভয় সব যেন কেমন থামিয়া যায়।

মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার ক্ষুধা আরও তীব্র হইয়া উঠিল। সেই সকাল বেলা থেকে খাইনি; ও বাড়ির রামু আর মণ্টু কখন খেয়েছে জলখাবার। জানালার ধারে বসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে কি সব বলতে বলতে ওরা খাচ্ছিল। উঃ। ক্ষুধা।

অস্ফুট একটা শব্দ তাহার গলার মধ্যে ঘড়-ঘড় করিয়া উঠিল।

কল্যাণী তাহার দিকে চাহিল, "কি রে, কি চাস?"

বেয়াড়া বাক্‌যন্ত্রকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিয়া গোরা পেটে হাত দিয়া বলিল—"আঁ—আঁ—" কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ হইতে খানিকটা লালা গড়াইয়া পড়িল, বাম হাত দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিল।

কল্যাণী সব বুঝিয়া ম্লান হাসিল—"আজ তো কিছু নেই বাবা—দাঁড়া ভাত চড়াচ্ছি—"

কিন্তু গোরা মাথা নাড়িল। না, মাগো আর পাচ্ছি না—পেট জ্বলে যাচ্ছে, শরীর অবশ হয়ে আসছে, খেতে দাও।

সানুনাসিক স্বরে সে বলিল—"অঁা—অঁা—অঁা—অঁা—" তাহার পেটের ভিতর বারংবার একটা যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতা পাক খাইয়া খাইয়া উপরে উঠিতেছে, সমস্ত অন্ত্র, নাড়ি যেন সে পাকে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। মা খেতে দেয় না কেন?

যন্ত্রণায় গোরা এইবার বসিয়া পড়িল। রান্নাঘর তাহার কান্নায় একটু পরেই মুখর হইয়া উঠিল।

তাহার কান্না দেখিয়া কল্যাণীর মনে দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় কি? কী করব আমি? শেখরের হাতে পয়সা নেই, হয়তো বিকেল নাগাদ সে কিছু আনবে। দিলীপের কাছে তো কিছুই নেই। পয়সা না থাকলে আমি কি করব, কি এনে দেব? কিন্তু ঐ অভাগা ছেলে তা বুঝবে কেমন করে?

বিষণ্ণ কণ্ঠে কল্যাণী বলিল—"কাঁদিসনে সোনা, এখুনি ভাত হয়ে যাবে—চুপ কর—"

কিন্তু গোরা থামিল না। একই ভাবে নিজের দুর্বোধ্য ও অস্ফুট শব্দমিশ্রিত কান্না কাঁদিয়া সে চোখের জলে ও মুখের লালায় বুক ভিজাইয়া তুলিল।

এইবার কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উঠিল, কোটা তরকারি জল দিয়া ধুইতে ধুইতে ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে সে বলিল, "তবু কাঁদছিস্‌! কিন্তু আমি কি করব বল দেখি—আমার কাছে কি আছে যে দেব?"

কিন্তু আট বছরের বালক—অত বুঝিল না, সে সমানে কাঁদিয়া চলিল।

"তবে আমার মাথাটা চিবিয়ে খা—আমিও বাঁচি, তোরও পেট ভরুক। উঃ—কি অদৃষ্ট নিয়ে যে তোরা জন্মেছিলি—"

ভবনাথের চিন্তাজাল গোরার কান্নায় ও স্ত্রীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ছিন্ন হইয়া গেল। ভাঙা চেয়ারটার উপর একটু নড়িয়া বসিয়া বাহির হইতেই সে প্রশ্ন করিল, "গোরা, কাঁদিস কেন রে?"

কল্যাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কেন তা বোঝ না? ছেলেমানুষ আবার কাঁদে কেন—ক্ষিদে পেলেই কাঁদে—"

ভবনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল,—"বেশ তো—দাও না ওকে কিছু খেতে।"

কল্যাণীর মাথা গরম হইয়া উঠিল। সংসারের সমস্ত অবস্থা জানিয়া বুঝিয়াও যদি ও অমন করিয়া কথা বলে, তবে কেহই মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, কল্যাণী আরও পারে না। ঘরে যদি কিছু খাবার থাকতো তবে কি আমি তা ঐ ছেলেটাকে না খাইয়ে তাকে ইচ্ছে করেই কাঁদাব! হতভাগা যে আমারই পেটের সন্তান—একথা কি ও জানে না! তবে কেন ও অমন কথা বলে? অমন নিস্পৃহ, নির্বিকার বৈরাগীর ভাব দেখিয়ে আমার কাছে বাহবা পেতে চায় কোন সাহসে? সংসারের দুঃখ কি একা ওই বয়ে বেড়ায়? কথাগুলি ভাবিতেই কল্যাণীর মাথা গরম হইয়া উঠিল। একঘণ্টা উনানের পাশে বসিয়াও তাহার যে মাথা উত্তপ্ত হয় নাই, স্বামীর ঐ কথা কয়টাই যেন তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দিল।

ক্ষিপ্তকণ্ঠে সে বলিল, "কথাগুলো বলতে তোমার লজ্জা হল না? বাড়িতে কি আছে না আছে—সে খোঁজ নাও কখনও?"

ভবনাথ ভাঙা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "মানে? আমি কি কোনও খোঁজ নিই নি?"

"নিলে অমন কথা বলতে না।"

এইবার ভবনাথের পালা।

রান্নাঘরের নিকট গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "দেখ উমার মা, কথাগুলো একটু ভেবেচিন্তে বলো—সংসারের খোঁজ নিই না তবে সংসার চলে কোত্থেকে?"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া বলিল—"ও, তাইতো, কথাগুলো আমার ভাবা উচিত ছিল বৈকি—নিশ্চয়ই, সংসার তো তুমিই চালাচ্ছ আজকাল—"

সপাং করিয়া কে যেন ভবনাথকে কশাঘাত করিল। হ্যাঁ, আজকাল আমি উপার্জন করি না। কিন্তু রূঢ় সত্যটা কল্যাণী আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে অপমান করতে দ্বিধাবোধ করল না! সংসারে বুড়ো বয়সে ছেলেদের রোজগার কি কেউ খায় না!

ভবনাথের একবার চিৎকার করিয়া কল্যাণীকে তিরস্কার করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু না, চেঁচিয়ে, ঝগড়া করে কি দারিদ্র্য দূর হয়? সবই সইতে হবে। স্ত্রীর উপহাস! তাতে কি,—কাল হয়তো ছেলেরাও উপহাস করবে, কিন্তু তাতেই বা কি? আমায় বাঁচতে হবে।

দ্রুতপদে ভবনাথ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চোখে জল আসে।

রাজপথ। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, দ্বিচক্রযান আর চতুশ্চক্রযানের ভিড। শব্দ।

টাকা চাই। দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভবনাথ মনে মনে বলিল—টাকা চাই। পাঁচ বছর ধরে আমি উপার্জন করি না। বড় ছেলেটা কাজ করত, দিন চলত, কিন্তু হতভাগা দেশকে ভালোবেসে কোন অগ্নিকাণ্ডে যোগ দিল। কোথায় সে আজকাল? পুলিসের চোখ এড়িয়ে কোন দুর্গম দেশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে? মেজ ছেলে? অভাবের জন্য তার পড়া হল না, কারখানায় কাজ করে তবু খাওয়াচ্ছে দুটো। দিলীপটাকে পড়াল তো এম. এ. পর্যন্ত—কিন্তু রোগ যাবে কোথায়? ও ভালোবেসেছে মুটে মজুরদের—মানুষদের—

"জুতোটা সেলাই করে নিন বাবু—চার পয়সায় হয়ে যাবে—" রামদাস মুচি বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে বলিল।

ভবনাথ নিজের জুতোর দিকে তাকাইল। জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া পুরাতন কাঠের মতো শক্ত, তালি লাগানো জুতা। কিন্তু পয়সা? একটা পয়সা থাকলে বোবা ছেলেটা খেতে পেত। টাকা চাই। আমার দুর্যোগের দিন কবে কাটবে? দিনকাল খারাপ। যুদ্ধ। পাঁচ বছর আগে কিন্তু এমন ছিল না। বাঃ, বেশ মেয়েটি।

একটি সুবেশা, সুন্দরী তরুণী ও একজন প্রৌঢ়া।

"না বাবা, ও ইয়াবিংটা আমার পছন্দ নয়—"

"তবে চল অন্য দোকানে।"

ধনী ভদ্রলোক। মেয়েটিকে সে ভালোবাসে।

ভবনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে কত অব্যক্ত কামনার ক্রন্দন। বেশ মেয়েটি। আমার উমার মতো সুন্দরী। না, উমা আরও সুন্দরী। বিচিত্র যৌবনের দেবতা। অর্ধাহারে, অনাহারে, দুঃখে, দারিদ্র্যে যৌবন পরাজিত হয় নি, তার সমস্ত শাখা-প্রশাখা, পুষ্পপল্লব নিয়ে অকৃপণ স্নেহে উমার দেহে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বড় গম্ভীর মেয়েটা। দুঃখীর ঘরের মেয়েরা অমন চঞ্চল, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল কেমন করে হবে? আহা, এই কদিনের জ্বরেই বেচারী রোগা হয়ে গেছে। বয়স হয়েছে—বিয়ে। টাকা? টাকা চাই—কিন্তু কোথায়? যুদ্ধ। টাকার পাহাড় চাই। বিয়ে দেওয়া কি সহজ ব্যাপার! বয়স হয়েছে উমার—আঠার বছর! পাড়ার দুশ্চরিত্র ছেলেরা দিবারাত্র কামনালিপি পাঠায় তাদের গান, তাদের চাউনি, তাদের কথার ভেতর দিয়ে। টাকা চাই—

রাজপথ। ভিড়। নানারকম কণ্ঠস্বরের অর্কেস্ট্রা।

"আইয়ে—ধরমতল্লা—এস্‌প্ল্যানেড—কালীঘাট—আইয়ে—" মোটা আর ভাঙা গলা।

"দয়া করুন বাবু—অন্ধমানুষকে দয়া করুন—"তোতা পাখির গলা।

"হ্যালো সুজিত, কোথায়?" মিহি গলা।

"বালিগঞ্জ—" অভিনেতার মতো সুর-করা গলা।

"বটে! সুচিত্রা দেবী বুঝি ঘাড় থেকে নামেন নি এখনও?"

সুজিত হাসিল। মিষ্টি হাসি। ওজনকরা হাসি। আনন্দের হাসি।

ভবনাথ হাসিল। আনন্দ! বিচিত্র এই পৃথিবী আর বিচিত্রতর এই জীবনযাত্রা। আলো-ছায়ার খেলা। ক্রন্দনরত লোকের পাশেই বহু লোক হাসে। তাদের লঘু হাসির তরঙ্গ বায়ুস্তরের শিরায় শিরায় মৃদু শিহরণ জাগিয়ে আমার মতো মানুষের কানে এসে যখন পৌঁছয় তখন মনে হয়—

মনে হয়—আমি অমন করে হাসতে পারি না কেন? আমি বুড়ো হয়ে গেছি—কবে মরব?

জুতার পেরেকগুলি পায়ে বিঁধিতেছে। ঠিক করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পয়সা? জামা কাপড় ময়লা হয়ে গেছে, কল্যাণীকে দিয়ে কাচিয়ে নিতে হবে। বেচারী—দোষ কি—অভাবে কার মাথা ঠিক থাকে?

একটি নগ্ন শিশু ফুটপাতে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

বেলা বাড়িতেছে।

স্বর্ণকারের দোকানে শো-কেশে গহনাগুলি ঝক-ঝক করিতেছে। আঠার বছরের মেয়ের হাতে কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু দিতে পারি নি।

হঠাৎ ভবনাথের দৃষ্টি ডান দিকের গলিতে পড়িল। দিলীপ আসিতেছে। দিলীপের মুখ চোখ শুষ্ক, মলিন, দৃষ্টি উদাস ও চিন্তিত, চলার ভঙ্গী ক্লান্ত। কোন সকালে উঠিয়া সে মাস্টারি করিতে বাহির হইয়াছে তাহা ভবনাথ দেখে নাই। একি চেহারা হয়েছে খোকার?

"বাড়ি ফিরছিস নাকি খোকা?"

দিলীপ চমকিয়া উঠিল, "অ্যা—ওঃ, বাবা।"

"বাড়ি ফিরছিস বুঝি?"

দিলীপ একবার এদিক-ওদিক তাকায়, যেন সে কিছু খুঁজিতেছে, পরে পিতার দিকে অর্থহীন নেত্রে চাহিয়া বলিল, "না—তপনের ওখানে যাচ্ছি—তারপরে বাড়ি যাব।"

তপন! ভবনাথ ক্ষুব্ধ হয়। তপনের যক্ষ্মা হয়েছে তবু তার কাছে কেন যায় খোকা! হাজার বার বলেও কিছু হয় নি—আশ্চর্য আমার ছেলেরা।

ভবনাথ দিলীপকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিল। দিনরাত খোকাটা যে কি ভাবে, বেশী কথা বলে না, বেশীক্ষণ বাড়িতে থাকে না। আশ্চর্য। প্রথম কথা বলত, শেখরও বলে, কিন্তু খোকাটা যেন সৃষ্টিছাড়া।

"তোকে এত শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে?"

"ভাবছি।"

"ভাবছি! কি ভাবার আছে তা তো বুঝি না বাবা, তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়, খেয়ে জিরো একটু।"

দিলীপ হাসিল। হাসি নয়, হাসির প্রেত। "তুমি এগোও বাবা, তপনের সঙ্গে দেখা করে তবে আমি বাড়ি যাব—"

ভবনাথ দিলীপের দিকে চাহিল। খোকাটা এমন নীরসভাবে কথা বলে যে ভয় করে।

তবু সে বলিল—"শরীরের যত্ন নে বাবা। রোদ্দুরে কোথায় ঘুরবি?—" ভবনাথের হৃদয় নামক যন্ত্রটির অন্তরাল হইতে আরো অনেক কথা, অনেক স্নেহের কথা উথলিয়া উঠে। কিন্তু সে বলিতে পারে না।

"আচ্ছা আমি যাই—"ভবনাথ চলিতে লাগিল। ভারি অদ্ভূত এই খোকাটা। দিনরাত কি যে ভাবে। আমি ভাবছি! দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়নায় ভাবতেই হবে। মাথা নিচু করে, পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল গতিতে বসে ভাব—ভাব—তাছাড়া, ছেলেটা বরাবরই চিন্তারাজ্যের বাসিন্দা—নাচ গান আর শিল্পচর্চায় দিন কাটায়। আমিও ভাবতাম। তখন আমি যুবক, আমার সুদর্শন চেহারা—আকাশে তখন পাখিরা উড়তে উড়তে গান গাইত, তবু—অতটা—ভাবা—

জনতার আবর্তে ভবনাথ তলাইয়া গেল।

"এই যে রমাপতিবাবু—ভালো তো?"

"কটা বাজল হ্যা?"

"মহাত্মা গান্ধীর নিউ মুভমেণ্ট আরম্ভ হবে—হ্যাঁ—শিগ্‌গীরই—"

"মাছের সের কত করে?"

"দশটা টাকা দেবে?"

"বাঃ—বেড়ে ছুঁড়ীটা—"

"তব্রুক এখন জার্মানদের হাতে—"

"চাল পাওয়া যাচ্ছে না, কি করি বল তো?"

"মেয়ের বিয়েয় সর্বস্বান্ত হয়েছি হে—"

"একটা বিড়ি খাওয়াও না মাইরি।"

পিতার গমনপথের দিকে একবার চাহিয়া দিলীপ হাসিল। পরে কোঁচার খুঁট দিয়া ললাটের স্বেদবিন্দু মুছিয়া আবার সে চলিতে লাগিল। অনেকটা চলার ফলে তাহার পায়ের শিরাগুলি টনটন করিতেছে, স্যাণ্ডালটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

রাজপথ জনাকীর্ণ। মানুষ আর যানবাহন, জন্তু আর যন্ত্র। মহানগরীর বক্ষস্পন্দন বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো উত্তেজিত। বড় গরম। সূর্য কোথায়? উর্ধ্বে আকাশে মেঘ নাই। ধোঁয়াটে বিবর্ণ আকাশে মেঘ নাই। সেই আকাশের বুকে সূর্য জ্বলিতেছে; তাহার উত্তপ্ত শ্বেতরক্তের দীপ্তিতলে মানুষের ক্ষুদ্র পৃথিবী। বিংশ শতাব্দীর সভ্য পৃথিবী। দিলীপ ভাবে। মানুষ কি ছিল আর কি হয়েছে। 'অমৃতরসায়ণ' পান করার পূর্বে ও পরে। ডারউইনের বনমানুষের নখর খসে পড়েছে, তার লোম আজকালকার সেফটি রেজার নির্মূল করে। দিলীপ হাসিল। মানুষ সভ্য হয়েছে, তার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা বেড়েছে, আদিম জগতের অন্ধকার গুহার পরিবর্তে আকাশ-চুম্বী অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। নিজের মনকে সে বিচার করে বিশ্লেষণ করে। চতুষ্পার্শ্বস্থ ভৌতিক জগৎকে নিজের বৈজ্ঞানিক অনুবীক্ষণের আয়ত্তে এনে সে নিত্য নব নব আবিষ্কার করছে, হ্যাঁ—মানুষ সভ্য হয়েছে।

কিন্তু কতদূর? দিলীপ নিজেকে প্রশ্ন করিল। কতদূর? ওজন কর, বিচার কর, মানুষ কতদূর সভ্য হয়েছে। সভ্যতা-বৃদ্ধি মানে মানুষের আনন্দ-বৃদ্ধি, তা কি ঘটেছে? বৈজ্ঞানিক কি আনন্দলোককে আবিষ্কার করতে পেরেছে? দিলীপ হাসিল। তাহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা। কিন্তু কে বলেছিল এ কথা?—হুঁ, তপন। সেই রোগা পাণ্ডুরবর্ণ, চঞ্চল ছেলেটি। সেই দরিদ্র বিদ্রোহী কবি। মৃত্যুকীটেরা তার বুকে বাসা বেঁধেছে।

"স্যার—দয়া করুন—"

একজন লোক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ছয় ফুট লম্বা, ছিন্নবসন-পরিহিত, চোয়ালভাঙা, কুঞ্চিত চর্মবিশিষ্ট। যেন দগ্ধ মরুভূমির একপ্রান্তে অবস্থিত পত্রবিহীন শুষ্কবৃক্ষ। তাহার কোলে একটি রোগা অথচ সুন্দরী বালিকা। পত্রবিহীন শুষ্কবৃক্ষে একটি বাসি ফুল। অবিশ্বাস্য তবু সত্য।

"স্যার—শুনছেন ?"

দিলীপ তাহার দিকে চাহিল।

"স্যার, আমি একজন গ্রাজুয়েট। আজ আমার এই ছেঁড়া কাপড় দেখছেন বটে কিন্তু Once I had my days too. আমি চাকরিও করতাম এককালে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কি কেউ জানে স্যার ?—দয়া করে কিছু সাহায্য করলে এই মেয়েটি বাঁচত—"

পয়সা ? দিলীপ পকেটে হাত দিল। সে জানে যে পকেটে পয়সা নাই, তবু সে তাহাতে হাত দিল। The age of miracles is not yet past.

লোকটি একটানা সুরে দ্রুতবেগে বকিয়া চলিয়াছে, "Please help me Sir, অন্তত একটা পয়সা দিন—মেয়েটাকে একটু দুধ খাওয়াতাম—" .

লজ্জা। নিদারুণ লজ্জা। একটিও পয়সা নাই। মূর্খ, the age of miracles is a myth.

"আমার কাছে কিছু নেই, মাফ করবেন।"

"Look at this child and have pity Sir—"

"সত্যি বলছি, কিছুই নেই আমার কাছে, সত্যি বলছি—"

লোকটি ডান হাতের তালু দিয়া ঠোঁটের পাশের ফেনা মুছিয়া সরিয়া গেল। ছোট মেয়েটির মুখ রৌদ্রে কালো হইয়া গিয়াছে। দিলীপ অনুভব করিল লোকটির মুখমণ্ডলে যেন মৃত্যুর ছায়া রহিয়াছে। ক্ষয়রোগ। তপন। তপন ধীরে ধীরে মরছে। ছমাস তার সঙ্গে দেখা হয় নি। যখন ডাক্তারেরা ওর অসুখের কথা প্রকাশ করে দিল, তখন জোর করে ওকে মায়ের কাছে পাঠানো উচিত ছিল। তপন গেল না—জোর করে রইল, মাস পাঁচেক পরে যখন অবস্থা আরও খারাপ হল তখন সে মায়ের কাছে গেল। কালকে তার চিঠি পেয়েছি। কাল রাত্রে সে এখানে আবার ফিরে এসেছে। কেমন আছে তা কিন্তু লেখে নি। আশ্চর্য। আর কিছুদিন থাকলেই পারত—ওঃ, খাবে কি ?—ওরা যে বড় গরিব, আমাদের চেয়েও। তপন তো ভিক্ষুকেরও অধম। কিন্তু হৃদয় ? তা কবির হৃদয়, আত্মার অনির্বাণ জ্যোতিশিখায় তা

ভাস্বর। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, গন্ধ, বর্ণ, রূপ, রস ও অনুভূতির সমারোহে ঐশ্বর্যমণ্ডিত তার হৃদয়। ওর স্বপ্ন একদিন পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে মহৎ রূপ দান করতে সাহায্য করবে—

চক্ষের সম্মুখে তপনের ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র। ক্রমে তাহা বড় হইল, আরো বড় হইল, শেষে যেন আকাশকে স্পর্শ করিল। ছোট বড় নানা কথা দিলীপের মনে পড়িতে লাগিল। নানাদিনের নানা কাহিনী। অশরীরি মন অতীতের সমাধি খনন করিতেছে। শীর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ, স্মৃতির প্রেতেরা তাহাকে ক্রমে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে……।

….সেদিন ছিল—হ্যাঁ, সেদিন ছিল বর্ষাকালের একটি নির্মেঘ পূর্ণিমা রজনী। গঙ্গার ঘাটের এক নির্জন প্রান্তে তপন আর আমি বসিয়া ছিলাম। দূরে আউটরাম ঘাটে বিদেশী জাহাজগুলোর ডেকে আলো জ্বলছে। শেড-দেওয়া আলো। যুদ্ধ! লোকেরা মরছে। ওপারে তেমনি আধো-আলোয় আলোকিত হাওড়া। কয়েকটা নৌকা ভেসে গেল, তাদের দাঁড়ের ছপছপ শব্দ সাগর-সঙ্গম—লুব্ধা স্রোতস্বিনীর কল্লোলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। গঙ্গার জল রুপালী হয়ে উঠেছে। (তপনের চেহারা আজকাল কি রকম হয়েছে—আরো রোগা?), তার তরঙ্গে তরঙ্গে রজত-শুভ্র চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে কাঁপছে। চারিদিকে গভীর প্রশান্তি।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটাবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ভাবছিস অত?"

তপন উত্তর দিল না, একই ভাবে সে দুকূলপ্রসারী গঙ্গার স্রোতসঙ্কুল জলরাশির দিকে চেয়ে রইল।

আমি তার কাঁধে একটা হাত রেখে হাসলাম। শিল্পী তপন পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে গেছে। ভাবলাম, আজ হয় তো সে বাড়ি ফিরেই ভাঙা হ্যারিকেনের স্তিমিত, ধূমায়িত আলোর সামনে দুর্বল দৃষ্টিকে প্রখর ও পীড়িত করে সাদা কাগজের উপর ছন্দোময় কথার সৃষ্টি করবে। এই ভেবে আমি হাসলাম।

হ্যাঁ, দিলীপ সেদিন হাসিয়াছিল। এখন কিন্তু সে আর হাসিতে

পারিতেছে না। সেদিন সে হাসিয়াছিল। তাহার সমস্ত কিছু এখন স্বস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে।

…আমি আর তপন বসে ছিলাম। সামনে রুপালী জল। আকাশে ঐ সূর্য তখন ছিল না, ছিল মায়াবী চাঁদ। তপনের কাঁধে আমি হাত রেখেছিলাম। এখনও যেন আমি তাকে অনুভব করতে পারছি।……

রাজপথ।

"এবারে একটা রেশ্কার্সের টিকিট কিনলুম ভাই!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ—দেখি যদি লেগে যায় দশহাজার—"

"তাহলে কি করবি?"

"কি করব? ওঃ—" লোকটি হাসিল, তাহার খোঁচা খোঁচা গোঁফের আড়ালে একপাটি ময়লা দাতের সারি দেখা গেল। তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখের সামনে দশ হাজার রুপালী ছবির মিছিল। মহানগরীর পথে বহু লোকের কথা। সব মিলিয়া কোলাহল।…কিন্তু সেদিন আমাদের কানে অত শব্দ আসে নি। শহরের কোলাহল-ধ্বনি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন চাকভাঙার ফলে একদল মৌমাছি গুঞ্জনধ্বনি তুলেছে।

…তপন আমার হস্তস্পর্শেও নড়ল না।

আবার ডাকলাম, "তপন—"

এইবার সে নড়ল, আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাল। মনে হল যেন সে সন্ত ঘুম থেকে জাগছে, যেন সে বহুদূরবর্তী এক রহস্যঘন জগৎ পর্যটন করে এই মাত্র প্রত্যাবর্তন করছে।

সে বলল, "কথা কসনে দিলীপ—"

"কেন?"

"ভাবছি।"

"কি?"

"আমাদের স্বপ্নের জগৎ কি মিথ্যা? মানুষের ছোট স্বপ্ন, ছোট আশা, কামনা সফল হয়, পূরণ হয়—আর বড় স্বপ্ন, বড় আশা কি পূর্ণ হবে না, সত্য হবে না?"

আমার সারা শরীর সে কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। আজকাল কি রকম স্বাস্থ্য তার। কেন যক্ষ্মা হয়? অভাব। আমাদের বাড়ি ভাত জোটে না। চালের দাম বেড়েছে—যুদ্ধ—লোকেরা মরছে—আহা, রক্তের নদীতে আর মাংসের পাঁকে পৃথিবীর শেষ দিনের ইঙ্গিত—আর কতদূর?

দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে প্রসারিত করে হঠাৎ তপন বলে উঠল—"ইচ্ছে করে সব ভেঙে চুরে ফেলি—সব বদলে দি—"

তপনের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। গঙ্গার জলে পূর্ণিমার চাঁদও কেঁপেছিল।

আবার সে বলল—"শুনে রাখ দিলীপ, বর্তমান যুগের মানুষের ব্যর্থ জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী আমি আমার কবিতাতে এবার লিখব, আর এটাও লিখব যে আমরা মরে গেছি—শুকিয়ে গেছি—"

তারপর?—না, আর কিছু মনে পড়ছে না। কেন? ভারী বেয়াড়া যন্ত্র এই মন।—

তপনের ছবি, সেই পূর্ণিমা রজনী বর্তমানের গ্রীষ্মালোকে মিলাইয়া যাইতেছে। বড় গরম। পূর্ণিমার চাঁদ সে রাত্রে গঙ্গার জলে কাঁপিয়াছিল। আজ কঠিন ও উত্তপ্ত পিচের রাস্তার উপর রৌদ্রালোকের উগ্র আত্মা কাঁপিতেছে।

একজন যুবকের সহিত দিলীপের ধাক্কা লাগিল। মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলার ফল।

"মশাই কি চোখে দেখেন না?" যুবকটি বলিল।

"মাপ করবেন—"

আর কতদূর তপনের বাড়ি?

দিলীপ ডানদিকের একটি গলি ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিসর্পিল গলি। সূর্যালোক আর বাতাস এখানে মলিন ও ভারাক্রান্ত।

আস্তে আস্তে রূপ বদলায়। পুরাতন ও জীর্ণ বাড়ির সারি আরম্ভ হয়। নর্দমা ও ময়লা।

দুইটি কুকুরে একজায়গায় উচ্ছিষ্টের স্তূপ লইয়া ঝগড়া করিতেছে। উৎসব-কোলাহল-মুখরিত একটি বাড়ির উচ্ছিষ্ট।

একটি ষাঁড় একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। তাহার লেজের ডগায় মাছির দল।

বামদিকের জানালায় একটি গৌরাঙ্গী কুমারীর কৌতূহলী মুখ। আকাশের সূর্য কোথায়?

দিলীপ থামিল। বস্তিতে আসিয়া সে পৌছাইয়াছে। তপন সেই পুরাতন কামরাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। তার শরীর এখন কেমন? ছমাসেই সে ফিরে এল কেন? টাকা—তা বটে—(মনে থাকে না)।

বাড়িটা দ্বিতল। তাহারি বাহিরের ঘরটিতে তপন থাকে। একটি ছোট কুঠরি! কিন্তু তাহার মধ্যে সঞ্চিত আছে কল্পনার বিরাট ব্রহ্মাণ্ড।

ঘরটির দরজা বন্ধ। ভিতর হইতে। বাহিরে তাহারি দেওয়ালে ঠেস দিয়া একটি বছর ছয়েকের নগ্ন বালক, এক হাত কোমরে দিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে শশের মিঠাই চুষিতেছে।

"এই—বাবু আছে?"

"হ্যাঁ গো, ভিতরে আছেক—"

"বটে!—ওরে তপন—তপন—"

কোনও সাড়া নাই।

"তপন—এই তপু—তপু—"

নগ্ন বালকটি হঠাৎ কি ভাবিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। একটি বিগতযৌবন কুক্কুরীও মন্থরগতিতে চলিতেছিল। লোমহীন ক্ষতদুষ্ট দেহ তাহার। তাহাকে বালকটিও হঠাৎ তাড়া করিল। কুক্কুরী ক্লান্তপদে পলাইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকটিও অদৃশ্য হইল।

"তপু—ও তপু—"

সাড়া নাই।

দিলীপ দরজা ঠেলিল। প্রথমে তাহা খুলিল না। আবার একটু জোরে ঠেলিতেই তাহা এবার আর্তনাদ করিয়া খুলিয়া গেল। ধূলি-মলিন ঘর,

মাকড়সার ঝুল, একটি ভাঙা চেয়ার ও টেবিল, এক গোছা মোটা মোটা বই। প্রাচীর-গাত্রে কয়েকখানি মলিন পরিধেয় ও একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নির্জন সমুদ্রসৈকতে অস্তগামী সূর্যালোক পড়িয়াছে। মেঝের একটি ছিন্ন তোশকের উপর তপন শুইয়া আছে। দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া সে শুইয়া আছে। তপন বড় রোগা হয়ে গেছে।

"ওরে তপু—ওঠ ওঠ—"

তপনকে সে ধাক্কা দিল। পাথরের মত শক্ত ও ঠাণ্ডা তাহার শরীর।

তপনের মুখ সে নিজের দিকে ফিরাইল। ভাঙা গাল, কোটরাগত খোলা চক্ষে বিভীষিকা, হাঁ-করা মুখবিবরে, দন্তপংক্তিতে, বালিসে—কালো রক্ত আর মাছি।

দিলীপ হাসিল। যুবক, তুমি মরেছ ?

ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। ঘরের মধ্যে মৃত্যু। একটি কঙ্কাল তাহার অতীত জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছে। মাছিগুলি ভনভন করিতেছে। আত্মা আছে কি।

দিলীপ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এবার কি করব ? কাঁদব ? না। সকলকে খবর দিতে হবে! তপন মারা গেছে। কে লিখবে সারা মানব সমাজের বিয়োগান্ত কাহিনী ? কবি মারা গেছে—কিন্তু বাইরের পুরোনো অথচ সুন্দরী পৃথিবী একই রকম রয়েছে—দিলীপ তুমি লেখ কবিতা—ঘরের মধ্যে মৃত্যু রয়েছে—তবু—

রোজ সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। তার আলোয় সুবর্ণ আর রক্তের ঝলক। আকাশ ঘননীল, তাতে মেঘরাশি উড়ে বেড়ায়। বায়ুস্রোতে গা ছেড়ে দিয়ে পাখিরা ভেসে যাচ্ছে, তাদের ডানার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ বায়ুস্তরে সঙ্গীতের সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবী বড় সুন্দর। প্রকৃতি ধ্যান করছে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়, অরণ্যের নির্জনতায়, বিস্তৃত প্রান্তরের ছায়ায়, আর অশান্ত সমুদ্রের সৈকতে। সুন্দর ও ভয়াল অরণ্যের অন্তরালে পশুরা আদিম উল্লাসে রত। মাটির বাধা ঠেলে অসংখ্য হরিৎ জীবনের বিকাশ হচ্ছে, বালিহাঁসেরা সন্ধ্যায় উড়ে যেতে যেতে দেখছে যে বিলের মধ্যে ফুটছে অজস্র রক্তপদ্ম। তারা অস্তগামী সূর্যের

রক্তিমাভা চুরি করে নিজেদের প্রসাধিত করেছে। হ্যাঁ—এই পৃথিবী সুন্দর। বহু পুরাতন অথচ অপরূপ সুন্দরী, হে অনন্তযৌবন। পৃথিবী—তোমায় প্রণাম জানাচ্ছি—

ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। বাহিরে বেলা বাড়িতেছে। ঘরের মধ্যে একটি কঙ্কাল শুইয়া আছে। তাহার কালো রক্তের মধ্যে অসংখ্য অদৃশ্য বীজাণুর কলরব। মাছিরা ভনভন করিয়া তাহাদের স'হত কথা বলিতেছে।

তপন মারা গিয়াছে।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়া যায়।

দিলীপের দৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিল, তাহাতে সেই পূর্ণিমা-রজনীব জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গার জল আর তপন।

...তপন বলল—"অত মিনমিনে ভাব কেন রে তোর? সব সময়ে মুখে হাসি রাখবি, মনে রাখিস যে আমরা স্বতন্ত্র জীব, আমাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি অন্যরকম। সব সময়ে হাসবি, পৃথিবীব সমস্ত দুঃখ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত পরাজয়ের মুখোমুখি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবি—দেখবি—সব তুচ্ছ হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "সব?"

"হ্যাঁ—সব কিছুকে—যা মানুষকে কষ্ট দেয়, ভীরু করে, তার শক্তিকে দুর্বল করে।"

"মৃত্যুকে?"

"মৃত্যু?—মৃত্যু তো একটা খোলস বদল মাত্র, তা ছাড়া, মৃত্যুঞ্জয়ী হতে গেলে মৃত্যুভয় করলে কি চলে?"...

উঃ, চক্ষু দুইটি জ্বালা করিতেছে। তপন মরিয়াছে। দিলীপ বসিয়া বসিয়া ভাবে। না, কেঁদে ফল নেই। কি করা উচিত এখন? বন্ধুবান্ধবদের খবর দিতে হবে। কাকে কাকে খবর দেব? বন্ধু তো অনেক আছে—কিন্তু সকলেই কি বস্তিতে আসবে? আচ্ছা, প্রথমে সন্তোষের ওখানে যাই—ওর আবার

অফিস আছে—তাতে কি? আজ যাবে না। সন্তোষ সেরকম নয়, সেও তো তপনকে ভালোবাসত—

দিলীপ উঠিল। তপন শুইয়া আছে। তাহার চোখে বিভীষিকা।

তপনের চক্ষু দুইটি সে নিমীলিত করিয়া দিয়া হাসিল, "আর কিছু দেখার মতো নেই কবি—তোমার দেখা শেষ হয়েছে।"

দিলীপ দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তপন কি একা থাকবে? মরা মানুষদেরও শত্রু আছে। থাকলেই বা কি? তাতে কতদূর ক্ষতি হবে? শেকল বন্ধ করে, পাশের লোকদের বলে যাই। আসতে আমাদেব দেরি হবে। তাতে কি? তাতে হয়তো তপনের শরীরটা একটু ফুলবে—মাছিরা হয়তো আরও ভিড কবে গান আবম্ভ করবে—আর কিছু নয়।

দিলীপ দরজায় শিকল লাগাইযা বাহির হইল।

পাশের ঘর দুইটিতে একজন লৌহকার থাকে। তাহার নাম রামলাল।

রামলাল লোহা পিটাইতেছিল। অগ্নি-দগ্ধ রক্তবর্ণ লৌহ। তাহার বাহুর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে ভয় লাগে। সারা দেহ বাহিয়া তাহার ঘামের বন্যা ছুটিতেছে, চওড়া বুকটা বারংবার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। বড় হাতুড়ির আঘাতে লৌহখণ্ড হইতে আগুনের ফুলকি ছিটকাইয়া পড়ে আর শব্দ হয় ঠন —ঠন, ঠন—ঠন।

রামলালের ভাই হরলাল—হাপরের দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে ঝিমাইতেছে। হাপরের শব্দ একটা ক্লান্ত পশুর দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, বায়ুস্পৃষ্ট কয়লার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, সারা কক্ষকে রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে।

"রামলাল—" দিলীপ ডাকিল।

হাতুড়ির শব্দ থামিল, "এই যে বাবু—কি চান?"

"দেখ—তপনবাবু মারা গেছেন—" দিলীপের কণ্ঠস্বর শুষ্ক।

"অ্যাঁ—তাই নাকি! আহা—"

"হ্যাঁ—ঘরটা শেকলবন্ধ করে গেলাম—আমি বন্ধুদের নিয়ে আসছি, একটু লক্ষ্য রেখো।"

রামলাল মাথা নাড়িল—"আচ্ছা, কিন্তু কি করে মারা গেলেন বাবু?"

"সে পরে শুন—"

দিলীপ হাসিল। কেন মাবা গেল? তুমি তা বুঝতে পারবে না রামলাল। যক্ষ্মা? বাইবের থেকে তাই মনে হবে বটে, কিন্তু এব পেছনে আবো ইতিহাস আছে। সমাজের, রাষ্ট্রের, নীতি ও ধর্মেব বহু আবর্তেব ইতিহাস। নাঃ, পা চালিয়ে চল।

হরলাল ঝিমাইতেছে। হাপরের শব্দ শোনা যায়। ক্লান্ত পশুর দীর্ঘনিশ্বাস। আব সেই দীর্ঘনিশ্বাসে শিহরিত অগ্নির রক্ত-দীপ্তি। বেলা বাড়িতেছে।

আবার গলি।

আবার রাজপথ। গ্রীষ্মকালেব প্রখর রৌদ্রালোকে উত্তপ্ত পিচেব রাস্তা। কালো, চকচকে, দীর্ঘ। জনবহুল ও যানবহুল, কোলাহল-মুখরিত। দূরে পথের প্রান্তে, উত্তাপসৃষ্ট মবীচিকা কাঁপিতেছে (চন্দ্রালোকিত রূপালী গঙ্গাব জল!) যেন বাজপথ হাঁপাইতেছে। উপবে সূর্য-শোভিত নির্মেঘ আকাশ দিগন্তপ্রসাবী নিষ্করুণ মরুভূমির মতো ধূ ধূ কবিতেছে। মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো। ওখানে ঝড় উঠিয়াছে—উত্তাপের ঝড।

দিলীপ চলিতে থাকে। মন ভালো লাগছে না। ঐ বিরাট আকাশেব মধ্যে যেন বৈরাগ্যেব ইঙ্গিত। কি করি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? আচ্ছা ঐ সূর্য যদি একেবাবে নিভে যায়, ঐ আকাশ যদি লুপ্ত হয়ে যায়! আমার মাথা খারাপ হয়েছে—আচ্ছা—মধ্যাহ্নে কি সূর্যেব পাশে চাঁদ উঠতে পারে না? সেই রাত্রিব মতো পূর্ণিমার চাঁদ? তপন মারা গেছে। আমি কাঁদব?

বেলা সাড়ে নয়টা। ক্রমবর্ধমান জনতার কোলাহলে মুখর মহানগরী। চঞ্চল, ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ জনতা।

একটি ধর্মের ষাঁড মন্থরগতিতে একটি গাভীকে অনুসরণ করিতেছে।

ফুটপাথের একধারে, যেখানটায় বেশ একটু ছায়ার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইখানে

পঞ্চা বসিয়া আছে। তাহার নোংরা চাদরের এক প্রান্তে পান্তাভাত ও ডাল মাখিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত সে ভোজন করিতেছে। সামনে বিরাট অট্টালিকার খিড়কির দরজায় গিয়া আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়াইয়া থাকার পর সে কয়টি পান্তাভাত লাভ করিয়াছে। তাহার অষ্টাদশ বৎসরের পুরাতন হাড় আর শুষ্ক চামড়ার নীচে তৃপ্তির শিহরণ খেলিয়া যায়। তাহার ভাঙা গাল ফুলিয়া উঠে, লালচে চক্ষু দুইটি সুখের আমেজে জলজল করিতে থাকে।—আঃ—

হাত চারেক দূরে একটি রুগ্ন ও লোমহীন কুকুরছানা ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার খাওয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"কেঁউ—"

পঞ্চা বলিল—"ভাগ শালা—"

সে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। আঃ—এমনি পান্তা যদি একবেলা করেও রোজ খেতে পারি গো তবে একমাসে মুটিয়ে যাব—হাঁ—

পঞ্চার প্লীহাপরিপুষ্ট পেট ক্রমে ফুলিতে লাগিল। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে সেই কুকুরছানার বিষ্ঠা, বামপার্শ্বে কোনও পথিক-নিক্ষিপ্ত কফ। তাহাতে কতকগুলি মাছি বসিয়াছে। তপনের মুখ।

দুইটি মাছি সেখান হইতে উড়িয়া আসিয়া এবার পঞ্চার পান্তাভাতের উপর বসিল।

"বাবুজী—একঠো পয়সা দো—"

দিলীপ থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি ভিখারিনী।

সে মাথা নাড়িল, তাহার শুষ্ককণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"নেই—"

সুরতিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিল—"নেই আছে—হারামজাদা আপনে যব মজা উড়াবে তব পয়সা কা কমি নেহি—হারামজাদা—"

পঞ্চার দৃষ্টি ঘুরিতে ঘুরিতে সুরতিয়ার উপর উড়িল। সে চিনে এই পশ্চিমা ভিখারিনীকে। শুধু সে নয়, শহরের সকল ভিক্ষুকই তাহাকে চিনে।

পঞ্চা ডাকিল—"সুরতিয়া—ওগো ও সুরতিয়া—"

সুরতিয়া ফিরিয়া তাকাইল। তার ধূলিমলিন ছিন্ন বসনের অন্তরাল

হইতে সুপরিপুষ্ট যৌবনসমৃদ্ধ দেহরেখার মদির হাতছানি। তাহার চোখের কটাক্ষ শাণিত অস্ত্রের মতো।

পঞ্চা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। কি সুন্দর মেয়েটা!

"ইদিকে আয় না সুরতিয়া—এই শুনছিস—"

সুরতিয়া হাসিয়া বলিল—"কাহেরে হারামজাদা?"

পৃথিবী ঘুরিতেছে।

"দিলীপ—"

দিলীপ চলিতেছে।

"দিলীপ—"

কে যেন ডাকিতেছে!

দিলীপ আবার দাঁড়াইল। যেন তপনের গলা। একি ভুল! মধ্যাহ্নে দিবসালোকে, জাগ্রতাবস্থায় আমার এ ভুল হচ্ছে কেন? তপন তো মরেছে। কবি। সাহিত্য। সাহিত্য কি? মানুষের জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনকে বৃহত্তর সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—জীবন কি, আর কি হলে ভালো হয় তারি ইঙ্গিত থাকবে তাতে। কিন্তু হায় বিংশ শতাব্দী! ব্যর্থ যুগের ব্যর্থ মানুষ আমরা। আমাদের জীবনের আমাদের যুগের বিয়োগান্ত কাহিনী কোন কবি, কোন সাহিত্যিক তার লেখনী-মুখে জীবন্ত করবে? তপন মারা গেছে। মৃত্যু। অমৃতত্ব কি ভাবে লাভ হয়? 'জ্ঞাত্বা ত্বং মৃত্যুম্ অত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।' ইতি কৈবল্য। ত্বং কে? ত্বং মানে পরমাত্মা। বিশ্বাস করব এই কথা? কিন্তু দরকার কি? আমার কর্মের দ্বারাই আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারি—তার সঙ্গে ঈশ্বর তো একাঙ্গীভাবে জড়িত। তপন বলেছিল একদিন এমনি কথা - সে...

..প্রায় দু-বছর, হ্যাঁ, সে প্রায় দু-বছর আগের কথা। বস্তির ওই ঘরটাতেই—কার্তিক মাসের একটি রাতে। পূর্ণিমার নয়, কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে চাঁদ ছিল না কিন্তু কম্পিতদ্যুতি নক্ষত্রের সমারোহ ছিল। অগণন নক্ষত্র।

তপন বলল, "সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ভঙ্গুর ভিত্তির ওপর বালির প্রাসাদ আর টিঁকবে না—"

আমি তখন অত বুঝতাম না, কিন্তু তবুও তপনের কথা শুনতে ভালো লাগত।

আমি বললাম, "কি যে বলিস তুই তপু, কিচ্ছু বুঝি না।"

সে হেসে বলল—"পরে বুঝবি—"

"কি বুঝব?"

"মানুষ যে পথে চলেছে, সে ভুল পথ। আরও কিছুদিন এমনভাবে চললে পৃথিবী থেকে মানুষ নামক প্রাণীকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠবে।..."

বেশ মনে পড়ে...ওর বালিশটা টেনে তার ওপর ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা—এ বিপদ থেকে মানুষকে কি রক্ষা করা যায় না তপু?"

তপনের চোখ স্তিমিত হয়ে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, "করা যায়, আর করতেই হবে।"

বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে?"

"মানুষের মনোবৃত্তি বদলাতে হবে, নিজেদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে হবে, যে সৌন্দর্যলোক ও সুন্দর জীবন থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে তার দিকে তাদের আকৃষ্ট করতে হবে।"

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম—"কিন্তু এ যে মস্ত বড় কথা তপু, এ যে বিরাট স্বপ্ন, আমরা কি তা সফল করতে পারব, এ কি কখনও সত্য হবে?"

বেশ মনে পড়ছে যে তপুর চোখ আমার কথায় জ্বলে উঠল, মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে সে বলল, "আমরাই পারব, আমাদের শিল্প, আমাদের কাব্য এখন সেই উদ্দেশ্যে তৈরী করতে হবে। জীবনকে সৌন্দর্যের পথে পরিচালিত করাই তো শিল্পের কর্তব্য। আমি তুই কে, আমাদের কতটুকু শক্তি—সমগ্র মানবজাতি আছে আর অনন্তকাল আছে—ভয় কি? মনে নেই?—

Others mistrust and say—But time escapes! Live now or never!

He said, what's time? Leave Now for dogs and apes! Man has Forever.

মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ—" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসলামও, "তুই বড্ড বড় বড় কথা বলিস তপন।"

তপন বলল, "হাসিস না, সাধারণের জন্য ও হাসি তুলে রাখ। সত্যি বলছি দিলীপ, আমাদেব স্বপ্ন সফল হবে। হয়তো সময় লাগবে, তা লাগুক; কিন্তু যেদিন তা সত্য হবে সেদিনকার আনন্দ অপচয়িত সময়ের মূল্যাপেক্ষা অনেক বেশী ফেরত দেবে—" তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল, একটু থেমে সে খানিকক্ষণ কাশল, তারপরে আবার বলল, "এমন কি মৃত্যুভয়ও সেদিন আমাদের থাকবে না, আমরা অমৃতত্ব লাভ করব—"

প্রশ্ন করলাম—অমৃতত্ব মানে?"

"একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকে বিশেষ মানসিক অবস্থা। মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে কুসংস্কার-মুক্ত মনে যখন মানুষেব প্রতি ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনও ভাব থাকবে না তাকেই আমি অমৃতত্ব বলি।"

"ঈশ্বরের অনুভূতি লাভকেও তো অমৃতত্ব লাভ বলে?"

"অমৃতত্ব লাভ করলে ঈশ্বেরর অনুভূতি জন্মাবে—শুধু তাই নয়, মানুষ নিজেই ঈশ্বর হবে।"

"কেন?"

"কারণ সে তখন অনুভব করবে যে সেও ঈশ্বরের একটি অংশ, তাকে ছাড়লে ঈশ্বরত্ব থাকবে না—আর—" আবার তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল, খুকখুক করে আবার সে কাশতে আরম্ভ করল।

তখন আমি তার দিকে ভালো করে তাকালাম! হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে পড়েছে ...Memory!...The memory throws up high and dry. A crowd of twisted things...সব সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, সেই নোংরা ঘর, মাকড়সার বাসা, মোটা বই, ভাঙা কুঁজো, চেয়ার,

টেবিল, নোনাধরা দেয়াল। ঘরের ভিতরকার কালি-পড়া চিমনিওয়ালা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতে আমি তপনের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেলাম। তার মুখে রক্তের ঔজ্জ্বল্য নেই, ত্বকে লাবণ্য নেই, চোখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি নেই, হাত-পা রোগা লিকলিকে —যেন তাতে কোনো শক্তি নেই। তপুর শরীরটা তো ভারী খারাপ হয়ে গেছে।

ডাকলাম, "তপু"—

"কি রে?"

"তুই ভারী রোগা হয়ে গেছিস, সময়মতো খাওয়া দাওয়া করছিস তো?"

সে হাসল, "হ্যাঁ খাই তো, আজ দিনে তো খুব পেটভরে খেয়েছি।"

"কি খেয়েছিস?" (উঃ কি গরম আজ! রাস্তার লোকগুলো কারা? শুনছ তোমরা, তপন মারা গেছে)।

"কেন—মুগের ডাল, ভাত, পালংশাক,—আর ঠাকুর আজকে এক চামচ ঘি আর চিংড়ির চচ্চড়িও দিয়েছিল।"

আমার চোখে জল এল। ক্ষতি কি? একফোঁটা জল। সব মনে পড়ছে।

('Midnight shakes the memory
As a mad man shakes a dead geranium')

স্বল্পাহাবে অনাহারে কি করে তপন মাথা ঠিক রাখে? (কেন ভাবছি পুরানো কথাগুলো)? কি করে সে সভ্যতা আর মানুষের কথা ভাবে? এত প্রেরণা সে কোথায় পায়?

বললাম, "না, না, ঠাট্টা নয়, ডাক্তারকে দিয়ে শরীরটা একটু দেখা, তোকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

তপন আমার দিকে ধীরে ধীরে তাকাল, তারপরে একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ভালোই হল, তোকে খবরটা দেবার সুযোগ পেলাম—"

জিজ্ঞেস করলাম, "কি খবর?"

"আজ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম—"

"তারপর ?"

"ডাক্তার দেখে বললে যে, আমার ডানদিকের বুকে যক্ষার বীজাণুরা বাসা বেঁধেছে।"

"তপন!" সাতঙ্কে, অবিশ্বাসের সুরে চীৎকার করে উঠলাম।

তপন মাথা নাড়ল, "না—সত্যি কথা।"

জোর করে হেসে বললাম—"মিথ্যে কথা, কোন বাজে ডাক্তারকে দেখিয়েছিস, ব্যাটা ভয় দেখিয়েছে—"

সে বাধা দিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে মৃদু গলায় বলল, "ডাঃ রায় বাজে নন, অনেকক্ষণ ধরে তিনি আমায় দেখেছেন।"

চুপ করে রইলাম। আধো অন্ধকার ঘরটা যেন একেবারে কালো হয়ে গেল। (এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি না কিছু—উঃ কি শব্দ)।

তপন হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, "আর এখানে আসিস না দিলীপ—"

আমি কথা খুঁজে পেলাম না। (চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।—Where are the snows of yester-year—ah! Where are they ?)...

"শুনছেন মশাই ?"

দিলীপের চমক ভাঙিল। সম্মুখে একজন বছর ত্রিশের লোক। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, ময়লা পোশাক, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি।

"বলুন—" দিলীপ বলিল।

"কি করে সুখী হওয়া যায় বলুন না মশাই—"

দিলীপ হাসিল, "সব কিছু ভুলুন, ভুলুন যে আপনি মানুষ—"

লোকটি মাথা নাড়িল, "উঁহু, বড় কঠিন বললেন মশাই—উঁহু—"

একজন সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া লোকটির হাত ধরিল, "আরে, তুমি পালিয়ে এখানে এসেছ রবি, চল ভাই বাড়ি চল—"

লোকটি মাথা নাড়িল, "চল্ল, কিন্তু শুনছেন মশাই—আমি ভুলতে পারি না যে আমি মানুষ—উঁহু—"

দিলীপ চলিতে আরম্ভ করিল। ঘামে তাহার জামা ভিজিয়া যায়, মাথার শিরা দপদপ করে, ক্লান্ত পাগুলি থামিয়া যাইতে চায়। সুখী কেমন করে হওয়া যায়? সুখ? The blue bird? পাগল হও।

"ভালো আছ তো দিলীপ?" নগেনবাবু প্রশ্ন করিলেন। তিনি রিটায়ার্ড ডেপুটি। দিলীপ কৃতী যুবক, তাহাকে তিনি চিনেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তাহলেই ভালো—বেলা কম হয় নি, না? দেখ না, এত বেলাতেও ঘুরতে হচ্ছে আমাকে—"

"কেন?" (তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে না হে বিচারক।)

"আর বল কেন, যুদ্ধের বাজার, চাল ভালো পাচ্ছি না হে—সব আগুন হয়ে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" (আমার যক্ষ্মা হয় নি তো?—বড় সংক্রামক ব্যাধি।)

"দশ টাকা মণের নীচে খাবার মতো চাল নেই, উঃ কি ব্যাপার বুঝতে পাচ্ছ? তাই বেরিয়েছি একটু, কয়েক মণ কিনে রাখতে হবে। কি জানি কি হয়, কখন যে আকাশ থেকে পড়বে আগুন আর মরণ কে জানে?"

দিলীপ চলিতে লাগিল। Vanity of Vanities. saith the preacher, all is Vanity.

"বুঝলে দিলীপ, এইবেলা কিছু স্টক করে রেখে দাও—এই যে, আমি এই আড়তটা একবার দেখে নিই—"

"নমস্কার!"

"নমস্কার—নমস্কার।"

রাস্তা দিয়া একদল কেরানী চলিয়াছে।

"অফিসে সেদিন বড়বাবু আমায় কি বললে জান ?"

"আমার পাঁচ টাকা ইনক্রিমেণ্ট হয়েছে—"

নানা বয়সের কেরানী। কোট, শার্ট, টুপি, ছিন্ন জামা, ময়লা কাপড়, হাফসোল-লাগানো পুরাতন জুতা, সিগারেট আর বিড়ি, পান আর দোক্তা নস্যি আর তালি-দেওয়া ছাতা, পকেটে কয়েকটা পয়সা, দুই একটা টাকা, পুঁটুলি-বাঁধা জলখাবার, ভাঙা গাল, ভুঁড়ি, অজীর্ণ, ময়লা দাঁত, নিষ্প্রভ চক্ষু, ছোট ছোট টেবিল-আর কাগজের স্তূপের স্বপ্ন। কেরানী। তাহাদের দেখিলেই চেনা যায়।

তাহাদের কথা।

"তব্রুক গেছে, বর্মা গেছে আর রাশিয়ার অবস্থাও তো কাহিল—এবার ?"

"মেয়েটার অসুখ সারছে না হে—কি করি ?"

"এ যুদ্ধ কবে থামবে বাবা ?"

"সেদিন ছোটসাহেবকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি, বলেছি—স্যার আপনি ইনজাস্টিস্ করেন বড়। অবিনাশ আমাদের জুনিয়ার হয়েও কেন লিফট পেল ? হ্যাঁ হ্যাঁ ভায়া, আমি কাওয়ার্ড নই।"

"ছেলেটা পরীক্ষায় ফেল করেছে—কি যে করি—"

"মরে আছি ভাই, আমরা মরে ভূত হয়ে আছি।"

বহুকণ্ঠের সম্মিলিত শব্দতরঙ্গ। মিছিল।

ক্ষুধার্তের কান্না—"একমুঠো খেতে দাও গো—"

দিলীপ থামিল। এই যে সন্তোষের বাড়ি। সন্তোষের বোন বীণা। ভালোবাসা। একটি কঙ্কাল শুয়ে আছে।

"সন্তোষ—"

কোন উত্তর নাই।

দিলীপ একটু অপেক্ষা করিল। সন্তোষ কি চলে গেছে চাকরিতে? না, তা কেন, কর্পোরেশনে তো ও এমনি সময়েই যায়।

"সন্তোষ—সন্তোষ আছিস ?" সে আবার ডাকিল।

"যাচ্ছি দিলীপদা"—বীণার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

দিলীপ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

বীণা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"সন্তোষ কোথায় বীণা?"

রান্নাঘর হইতে সন্তোষের উত্তর ভাসিয়া আসিল, "আমি খাচ্ছি, একটু বোস রে—"

দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বীণা হাসিয়া উঠিল, "উঃ, বন্ধুত্ব তোমাদেরই বটে, তোমার ডাক শুনেই দাদা একেবারে নাকে মুখে ভাত গুঁজছে—"

দিলীপ ম্লান হাসিল। তখন কি যেন ভাবতে ভাবতে থামলাম? ওঃ, ঠিক, তপনের কথা—ডাক্তারেরা যক্ষ্মা ডিক্লেয়ার করার পরেও সে মাস তিনেক ঐ বস্তিতেই থাকল। তিন মাস? মহাকালের বিরাট রঙ্গমঞ্চে ও তিন মাস কিছুই না। কিন্তু এই তিন মাসে যক্ষ্মার বীজাণুগুলি অনেক কাজ করল। তপনের ডানদিকের বুক থেকে তারা বাঁ দিকে বাসা বদল করল। পয়সা নেই, সুতরাং ওষুধ নেই…

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে চল।" বীণা বলিল।

"না।"—সে হাসপাতালে পড়ে রইল (টিংচার বেঞ্জাইনের গন্ধ, আর্তনাদ, গোঙানি আর রুগ্ন মুখের সারি) কয়েক মাস। কিন্তু তার আত্মা কেমন করে একটা ছোট কামরার পরিধিতে সন্তুষ্ট হবে। সে দেখে বিরাট পৃথিবীর স্বপ্ন, বিরাট আকাশ তার মনোরাজ্যের প্রাসাদশীর্ষ। সে টিঁকতে পারল না—

"তবে একটা চেয়ারে বোসো না।" অনুযোগের সুরে বীণা বলিল।

দিলীপ বসিল।—শেষে সে একদিন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এল (বীণা আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে কেন?), আমাদের সঙ্গে দেখা করে মায়ের কাছে ফিরে গেল। মরবার আগে মায়ের মনে খানিকটা তৃপ্তি দেওয়ার ইচ্ছে তার হয়েছিল। তা ছাড়া মরণ আসন্ন জেনে (মা তাকে কি খেতে দিত?) তার সমস্ত হৃদয় স্নেহ, যত্ন, সেবা ও ভালোবাসার

জন্য (—মোটা লাল চালের ভাত, একটা মাছের ঝোল, কলমি শাকভাজা, আর হয়তো দত্তবাড়িতে খেটে-পাওয়া একপো দুধ—) আকুলি বিকুলি করে···।

"তোমার চোখ অত শুকনো কেন দিলীপদা ?"

বীণার কণ্ঠে ব্যাকুলতা আর উদ্বেগ। দিলীপ তাহার দিকে চাহিল। সপ্তদশী বীণা গৌরাঙ্গী, নাতিদীর্ঘ আকৃতি। মুখাকৃতি লম্বা ধরনের, চক্ষু দুইটি ডাগর অথচ অর্ধ-নিমীলিত, মস্তকের কেশরাশি কটিদেশ ছাড়াইয়া নীচে নামিয়াছে, ঠোঁট দুইটি পাতলা, তাহার কোণে একটা দৃঢ়তার রেখা। অস্বাভাবিক একটা কাঠিন্যে তাহার সারা দেহ মণ্ডিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে বসন্তের পুষ্পসম্ভারের মতো মাদকতাময় তাহার যৌবনশ্রী।

"কথা বলছ না কেন ? কি হয়েছে ?" বীণা আবার প্রশ্ন করিল। দরজার উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দুইটি অর্ধ-নিমীলিত চক্ষুকে তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময় করিয়া সে তাহার হৃদয়ের উদ্বেগ প্রকাশ করিল।

দিলীপ ভাবে। আমি কি ভাবছিলাম ? · তারপরে ? বীণা আমার দিকে অমন করে চাইছে কেন ? তার কণ্ঠস্বরে এত ব্যাকুলতা, এত করুণ ভাব কেন ?—হ্যাঁ···তপন যখন বাড়ি যায় আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম। মস্ত বড় ইঞ্জিনটা হাঁপাচ্ছিল, যাত্রীদের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের চীৎকার প্ল্যাটফর্মকে মুখরিত করে তুলেছিল। কিন্তু এত শব্দের মাঝেও আমরা একটা গভীর নৈঃশব্দ্য, একটা সুবিশাল নির্জনতা অনুভব করছিলাম। আমি যেন এক আলোকিত গ্রহের লোক আর তপন যেন বহুদূরবর্তী এক মৃত গ্রহের লোক। আমাদের দুজনের মাঝে অনন্ত শূন্যতার ব্যবধান। অনেকক্ষণ চুপ করে আমরা বসে ছিলাম···অনেকক্ষণ···

"বাঃ রে, তুমি কি বোবা হয়ে গেলে নাকি ?" বীণার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। বাতাহত দুইটি রক্তপুষ্পের মঞ্জরী।

"না, আমি বোবা হই নি বীণা, আমি ভাবছি।"

"ভাবছ তো দিনরাতই, তাই বলে মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে নেই নাকি ?" বীণার কণ্ঠে অভিমান।

"কি প্রশ্ন তোমার বল—" দিলীপ ক্লিষ্ট হাসি হাসিল।

"কি ভাবছ অত ?"

"তপনের কথা।"

"কি হয়েছে তপনদার ?

"সে মারা গেছে—তার যক্ষ্মা ছিল, তা তো জানতে, না ?"

"অ্যাঁ—" বীণার কণ্ঠস্বর শুষ্ক, অস্পষ্ট।

"তপন মারা গেছে।" বিড়বিড় করিয়া দিলীপ আবার বলিল।

বীণার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। সে একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তপনকে সে শ্রদ্ধা করিত।

দিলীপ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সংকীর্ণ গলিতে ও পাশের বাড়ির প্রাচীরগাত্রে তাহার দৃষ্টি প্রতিহত হইল। মানুষ মরে কেন ? প্রকৃতির রাজ্যে মৃত্যু একটা নিয়ম। মৃত্যুর স্বরূপ কি ?

"কি রে দিলীপ ? কি ব্যাপার ?"—সন্তোষ পান চিবাইতে চিবাইতে কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার অফিসের সময় হইয়া গিয়াছে।

দিলীপ তাহার দিকে চাহিল। এখনই খবরটা দেওয়া কি উচিত ? কিন্তু উপায় কি ? লোক চাই যে। বীণার চোখ ছলছল করছে।

"কি রে, কথা বলছিস না যে ? আমার সময় হয়ে গেছে।"

দিলীপের গলার ভিতর কি যেন বিঁধিয়া আছে।

"বাঃ, বল কি বলবি ?"

বীণা ভিতরে চলিয়া গেল।

সন্তোষ দিলীপের দিকে চাহিল। কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। আশঙ্কা-জনক।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে দিলীপ ?"

"তপন মারা গেছে।"—হঠাৎ কথাগুলি দিলীপের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল যে একটু ঘুরাইয়া ভূমিকা করিয়া সংবাদটি সন্তোষকে জানাইবে, কিন্তু তাহা হইল না। হঠাৎ কথাগুলি অত্যন্ত সাধারণ ও নিষ্ঠুরভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

"অ্যাঁ!"—সন্তোষ যেন বিশ্বাস করিল না কথাটা, তাহার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের ভাব।

দিলীপ মাথা নাড়িল।

"এত তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ—কিন্তু ব্যাধিটাও তো কম নয়। এই ভালো যে এর যন্ত্রণা থেকে সে রক্ষে পেয়েছে—"

হ্যাঁ—সন্তোষ জানালার ধারে গিয়া দিলীপের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। দুরন্ত ক্রন্দনাবেগকে চাপিতে গিয়া তাহার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

"হ্যাঁ—ভালোই হয়েছে বটে, তবু—কেন মরল সে?" সন্তোষ বলিল।

দিলীপ হাসিল, "তা বটে, একটা 'তবু' আছে। ওকি! তুই বুঝি কাঁদছিস! মরা মানুষের জন্য কেঁদে কোনো ফল নেই। (মানুষেরা মরছে, বীরেরা মরছে, পৃথিবী পুড়ছে, কেঁদো না—কেঁদো না—) নে চোখের জল মুছে নে।"

বীণা আবার ঘরে আসিল। এককোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্তোষ চোখের জল মুছিয়া হাসিল, "হ্যাঁ, কেঁদে ফেলেছি। যাক—ও কি এখানে ফিরে এসেছিল?"

"হ্যাঁ—"

"এখন কি করবি?"

"তুই বিনয় আর সরোজকে ডেকে নিয়ে সেই পুরোনো বাড়িতে আয়, আমি হরেন, দ্বিজেন আর সমরকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"বেশ। আমি তাহলে এখন যাই, গোবিন্দবাবুকে ছুটির একটা দরখাস্ত দিয়ে আসি।"

"আর অমনি থানায় একটা রিপোর্ট দিয়ে দিস।"

"আচ্ছা—আমি চললাম।"

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল।

দিলীপ বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বীণা ডাকিল, "দিলীপদা—"

দিলীপ থামিল। ওঃ, বীণা দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টে এখনও সে আমার দিকে তাকিয়ে! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—কি করি? বীণা কি চায়?

"কি বলছ বীণা?"

"আমার দিকে একবার না তাকিয়েই যে যাচ্ছ?"

দিলীপ হাসিল। কি বলব তোমায়? তুমি কি চাও? তুমি আমায় ভালোবাস বীণা? আমিও তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু পৃথিবীতে একটি সুন্দরী নারীকে ভালোবাসা ছাড়াও তো অনেক বড় আর গুরুতর কাজ আছে।—

> I am frightened, sweet heart—
> that's the long and short
> Of the bad mind I bear : the scent
> comes back,
> Of an unhappy garden gone to
> wrack.

কবিতা। বন্দী মানুষদের আর্তনাদে বুক কেঁপে উঠছে। যক্ষ্মা। ট্রেঞ্চের আড়ালে গলিত শবের বিলাপ। বীণা, কি চাও?

"এই তো তাকালুম—" দিলীপ বলিল।

"বেশ—" বীণা একটু হাসিল, পরে আবার বলিল, "ফিরতে তোমার অনেক দেরি হবে, খাওয়া-দাওয়া যে হয় নি তাও বুঝতে পাচ্ছি—"

"অতএব?"

"এখান থেকে খেয়ে যাও!"

"না বীণা, এখন দেরি করার সময় নেই। ওদিকে ওর শরীর ফুলবে।"

—কখন মরেছে তা তো জানি না (মাছিগুলো কি এখনও ভনভন করছে?)"

"খাবে না?" বীণা বলিল। হতাশার সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

দিলীপ একটু বিচলিত হইল। সে বীণার দিকে চাহিল। সুন্দরী বীণা। ভালোবাসা?

'নাগিণীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'—

বীণা দিলীপের দিকে চাহিল। একি মানুষ? দিলীপ মানুষ নয়। মানুষেরা কি মানুষের জন্য ভাবে, কাঁদে? ও শাপভ্রষ্ট দেবতা। কি সুন্দর ওর মুখখানা, যেন কোনো গ্রীক দেবতার প্রতিমূর্তি। আমি সাধারণ মেয়ে, আমি কি ওর ভালোবাসার যোগ্য! কিন্তু কি করব? আমি তোমায় ভালোবাসি, হে স্বপ্নদর্শী, আমি তোমায় ভালোবাসি।

বীণার চোখের একাগ্র দৃষ্টি বাইরের সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত।

"তুমি আজ কি কি রান্না করেছ বীণা?" দিলীপ হাসিল। বুঝতে পারছ হে কুমারী, আমি অভিনয় করছি। ভালোবাসার চেয়ে বড় জিনিস অনেক আছে। তবু—তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্য বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অমৃতমন্থন চলছে, কিন্তু হায়, খালি বিষ উঠছে। সে বিষ ধারণের ক্ষমতা আমাদের নেই। নীলকণ্ঠরা তো মারা গেছে। বন্দী মানুষ আমরা। স্বাধীনতা। আমরা কবে স্বাধীন হব? গান্ধীজীর নিউ মুভমেণ্ট কবে থেকে আরম্ভ হবে? কাল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন! শৃঙ্খল ভেঙে ফেল—ভেঙে ফেল—

"ওমা! তাই শুনে বুঝি খাবে? তা গরিবের ঘরে বেশি কিছু হয় নি—ডাল, ভাত, মাছের তরকারি, ভাজা, অম্বল আর ছানার পায়েস। কেমন, পছন্দ হল?" অধীর আগ্রহের সহিত বীণা বলিল।

দিলীপ বলিল, "শুধু পছন্দ নয়, লোভও হচ্ছে, কিন্তু আজ নয় বীণা—অন্য কোনো দিন আমি তোমার হাতে খেয়ে যাব।"

বীণা উত্তর দিল না।

"তুমি রাগ কোরো না বীণা।

"না, আমি রাগি নি তো।"

"আচ্ছা তুমি আমায় এক গেলাস জল খাইয়ে দাও বীণা, তোমায় একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি না।"

বীণা হাসিল। অর্ধ-প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের মতো সুন্দর দুইটি ঠোঁটের আড়ালে কয়েকটি মুক্তাখণ্ডের মতো শুভ্র দাঁত ঝকঝক করিয়া উঠিল।

"এখুনি আনছি—তুমি বোসো।"

রাজপথের কোলাহলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। দিলীপ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। যক্ষ্মা কেন হয়? চিন্তা, দুঃখ, দারিদ্র্য। 'স্যর, আমি একজন গ্রাজুয়েট।' শিল্পীরা এই সন্ধিক্ষণে কি করিবে? Look at this child and have pity Sir. যেন পত্রবিহীন শুষ্ক বৃক্ষে একটি বাসি ফুল। আমরা তো মানুষের হৃদয়কে বদলাব, অনুপ্রেরিত করব, কিন্তু দারিদ্র্য? শঙ্কর। শঙ্কর বলে যে সাম্যবাদ ছাড়া উপায় নেই। উঃ কি গরম! তপন মরেছে। তার বুকের নিভৃতে যারা বাসা বেঁধেছিল, তারাও মরেছে—হ্যাঁ, তপনের কথাটা আবার মনে পড়েছে।...

....আমরা চুপ করে বসে ছিলাম। কামরার এককোণে বসে তপন বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দূরের মাঠের মধ্যে তার দৃষ্টি। সেখানে সবুজ ধানের মাথাগুলো দুলছিল। নবীন প্রাণের রসধারায় অভিষিক্ত সঞ্জীবিত কচি চারাগুলো।

হঠাৎ সে বলল, "এই শেষ দেখা।"

বললাম, "কি যে বলিস, চুপ কর।"

"না, সত্যি বলছি।"

"কেন?"

"কেন?" (আমার যক্ষ্মা হয় নি তো? এত মিশতাম তপনের সঙ্গে?)

"দুটো বুকই ঝাঁজরা হয়ে গেছে।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে।" জোর করে বললাম।

"পাগল!" তার কণ্ঠে অনুভূতির স্পন্দন।

"দুঃখ নেই তাতে—" সে বলে চলল, "আমি আমার যথাসাধ্য করেছি।

তুইও তোর যথাসাধ্য তোর সাহিত্যসাধনার ভেতর দিয়ে করিস ভাই—" তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, একটা কাশির বেগও উঠল।

দুহাতে বুকটা চেপে ধরে সে খকখক করে কাশতে লাগল।

অন্তরে অন্তরে বুঝলাম এই শেষ দেখা। তার মুখের দিকে তাকালাম। …বেশ মনে পড়ছে…তার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। তার চোয়াল ঠেলে ওপরে উঠছে, বর্ণ ছাইয়ের মতো, হাত-পা লিকলিকে, চোখে কাশির বেগে জল এসেছে।

কাশতে কাশতে হঠাৎ সে বলল, "আজকাল ভারি বাঁচতে ইচ্ছে করে দিলীপ—কি করি?"

তপন আবার কাশতে লাগল। দুর্দমনীয় বেগ।

হুইসিলের শব্দ শোনা গেল। নামলাম।

তপন তখনও কাশছে।

হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে এক ঝলক রক্ত বমি করেই ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে সে আমার দিকে চাইল। তারপর একটু হাসল। সে হাসি ভুলব না।

তারপরে—কতদিন পরে আজ তাকে দেখলাম। জীবন্ত নয়, মৃত।…উঃ, বাইরের রোদ্দুর যেন শান-দেওয়া ক্ষুরের ফলা। বাঃ, দেওয়ালের ওপর একটা টিকটিকি একটা মাছির দিকে এগোচ্ছে—ধীরে—ধীরে—

"এই নাও—"

বীণা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার একহাতে একগ্লাস লেবুর শরবত, অন্য-হাতে একটি প্লেটে দুইটি সন্দেশ।

"একি ব্যাপার বীণা?"

"বেশি কথা বলে দুঃখ দিও না, খাও।"

"আচ্ছা খাচ্ছি, কিন্তু ফিরিস্তিতে এ সন্দেশ তো ছিল না?"

"কারণ এ ঠাকুরের পুজোর সন্দেশ। মা পুজো করে এই মাত্তর তুলসী-তলায় গেছেন, সেই ফাঁকে নিয়ে এসেছি—নাও খাও।"

"তুমি ঠাকুর দেবতা মান না?" (তুমি কাকে ভালোবাসলে বীণা?)

"না।" (পটের দেবতার চেয়ে তুমি ঢের বড় সত্য।)

দিলীপ খাওয়া শেষ করিল। বীণা আমার দিকে চেয়ে আছে। মেয়ে জাতটা অদ্ভুত। উমা বড় গম্ভীর, বীণার মতো এমন কথা বলে না, রাগে না, অভিমান বা অনুযোগ করে না। উমা যেন পাষাণ, তার যেন কোনো চেতনা, কোনো অনুভূতি নেই। বীণা আমায় ভালোবাসে। বীণা তুমি সুন্দর। তবু তুমি আমায় ভোল।

"চললাম বীণা।"

"মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না?"

"পরে আসব।" (তপনের শরীর কি বেশি ফুলেছে, তার দেহের দুর্গন্ধে তার কক্ষের আবহাওয়া ভারি হয় নি তো?)

"সন্ধ্যেব দিকে একবার এস—"

"চেষ্টা করব।"

"না, নিশ্চয়ই এস। বল আসবে?" বীণা হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া দিলীপের হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

দিলীপ হাসিল, "আচ্ছা আসব।"

গলির মোড়ে পৌঁছাইয়া দিলীপ হঠাৎ একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। বীণা বাহিরের দরজায় হেলান দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম হাত কোমরে, ডান হাত ঝুলানো, ললাটের উপর কয়েকটি চূর্ণ-কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে, আঁচলটা ডান হাতের পিছন দিয়া চৌকাঠ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সে দৃষ্টি দিয়া সে প্রিয়তমের পথের সমস্ত বাধাকে যেন ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে!

দিলীপ চলিতে লাগিল। বাঃ ছবির মতো দৃশ্যটি। ভালোবাসা।

'কি করিলে বালা?
কার গলে দিলে তুমি বনফুলমালা?'

রাজপথ।

"আরে দিলীপবাবু যে

শঙ্কর ডাকিতেছে। শালবৃক্ষের মতো দীর্ঘ, মজবুত তাহার দেহ, তেমনি তাহার মন। বহুবার জেল খাটিয়া, কারখানায় লোহালক্কড় পিটাইয়া, উত্তপ্ত ইঞ্জিন চালাইয়া তাহার মন দেহের মতোই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মাথার চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, রুক্ষ, মাঝখানে একটু টাকও আছে, মুখমণ্ডলে বসন্তের কয়েকটি গভীর চিহ্ন। চোখ দুইটি তাহার ছোট, আর তাহার মধ্যস্থিত দীপ্তি আর অগ্নি আহত ব্যাঘ্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। শঙ্কর লেবারপার্টির সম্পাদক।

"খবর শুনেছেন দিলীপবাবু?"

"কি?"

"গান্ধীজী, নেহেরু···এঁদের সকলকে বন্দী করা হয়েছে"—শঙ্কর বলিল। তাহার মুখমণ্ডলে মেঘের কালিমা!

দিলীপ থমকিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর হাসিল, "থমকে দাঁড়ালেন! তাতে আশ্চর্য হবার অবশ্য কিছুই নেই, ব্যাপারটা সত্যিই আকস্মিক নয়।"

দিলীপ উত্তর দিল না। নিউ মুভমেণ্ট! আজ থেকে পৃথিবী যেন বদলাচ্ছে। তপন মারা গেছে। আর দেবি করা উচিত না; হরেন, দ্বিজেশ আর সমরকে খবব দিতে হবে। কিন্তু নেতারা কারারুদ্ধ! শৃঙ্খল কি ভাঙবে না? আঘাতের প্রতিঘাত আছে, হে বণিকদল, সতর্ক হও—

শঙ্কর বলিল—"আজ সকালে রেডিওতে খবরটা শুনলাম, ইতিমধ্যে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়েছে—"

দিলীপ শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মুভমেণ্ট তো আরম্ভ হয় নি—এরই মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করা হল কেন?"

শঙ্কব আবার হাসিল, "মুভমেণ্টের জন্য মিটিং করা মানেই তো মুভমেণ্ট আরম্ভ করা।"

দিলীপ মাথা নাড়িল, "এবার?"

"এবার?—হয়তো রক্তের স্রোত দেশের মাটিকে উর্বর করবে।"

"আপনি দেশকে ভক্তি করেন শঙ্করবাবু?"

"কেন করব না?"

"শ্রমিকেরা তো আন্তর্জাতিকতায় বেশি বিশ্বাস করে।"

শঙ্কর মাথা নাড়িল, "ভুল কথা বলছেন, জাতীয়তায় বিশ্বাস না থাকলে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস কি করে হবে? তা ছাড়া আমরা তো শূন্যের মধ্যে বাস করি না, আমরা দেশেই থাকি।"

"তবে কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের মতবিরোধ কেন?"

"আমাদের দাবির জন্য—কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের মতের পার্থক্য নেই।"

"এবার আপনারা কি করবেন?"

শঙ্কর স্থিরকণ্ঠে বলিল, "চট করে কিছু বলা যায় না, তবে একটা কিছু করব—আগে ঘটনাচক্র লক্ষ্য করি—"

দিলীপ চুপ করিল। তাই তো, এবার কি হবে? আবার মিছিল, উত্তেজিত জনতার পদশব্দ, ত্রিবর্ণ পতাকার আন্দোলন, সহস্র সহস্র কণ্ঠের চিৎকার (স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার), লাল পাগড়ি, শক্ত লাঠি, ধাবমান অশ্বের দ্রুতগতি (তপনটা মরে গেছে), দলেদলে লোক গ্রেপ্তার—আর—আব কি? রক্ত? শঙ্করের কথা কি ঠিক? বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। চল্লিশ কোটি ভারতবাসী—তোমরা ক্রীতদাস—(না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, শিকল-লাগানো ঘরে মৃতের আত্মা পায়চারি করছে) এবার তৈরী হও। আমি শিল্পী—আমার এবার কি কর্তব্য? তপনটা মরে গেছে—

"কি ভাবছেন দিলীপবাবু?" শঙ্কর চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল।

"অ্যাঁ? ওঃ—কিছু না।"

শঙ্কর বিশ্বাস করিল না, "উঁহু, কিছু নিশ্চয়ই ভাবছেন আর সে ভাবনা যে পীড়াদায়ক তা আপনার মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।"

"শুনবেন?" দিলীপ গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল। রাজপথে কি ভিড়! পৃথিবীতে এত মানুষ! মানুষ না অমানুষ!

"বলুন, অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।"

"তপনকে চিনতেন ?" (আমার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।)

"তপন। ওঃ—সেই যে ছেলেটি কবিতা লিখত—সে ?"

"হ্যা।"

"চিনতাম বই কি, তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক তেজ আর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ছিল।"

"সে মারা গেছে।"

শঙ্করেব মুখের ভাব একটুও বদলাইল না, ললাটে একটিও রেখা ফুটিল না, চোখের পাতা বা ভ্রূ কাঁপিয়া উঠিল না, যেমন সন্তোষের হইয়াছিল। শঙ্কর সন্তোষ নয়। মানুষের মৃত্যু লইয়া সে মাথা ঘামায় না, মানুষের বাঁচিয়া থাকা লইয়াই তাহার সংগ্রাম।

"ওঃ, কি হয়েছিল তার ?" একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

"যক্ষ্মা।"

"হ্যাঁ—একবার শুনেছিলাম বটে, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে সেরে গেছে।" তাহার কথাগুলি নীরস, শুষ্ক, তাহাতে একটা জ্বালাময় ব্যঙ্গের আভাস আছে।

দিলীপ একটু আহত হইল।

সে বলিল, "যক্ষ্মা কি সারে ?"

রূঢ়কণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "সারে বই কি (তোমরা সব কেবল বড় বড় স্বপ্ন দেখ, কিন্তু তবুও কিছু করতে পার না কারণ তোমরা বাস্তবকে এড়িয়ে যাও)—যক্ষ্মাও সারে, কিন্তু সে টাকা থাকলে! তপনবাবুর তা ছিল কি ?" (গতানুগতিক জীবন তোমরা পছন্দ কর না কিন্তু অজ্ঞাতে তাই যাপন কর, শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের কুসংস্কারগুলো পর্যন্ত তোমাদের মনের কোণে বদ্ধমূল হয়ে আছে;—তোমরা এখনও বুর্জোয়া—এইখানেই তোমাদের ট্রাজেডি)।

দিলীপ উত্তর দিল না। ঠিকই তো; টাকা থাকলে সবই সারে। কিন্তু কোথায় ছিল সে টাকা ? জমিদারের সিন্দুকে, বড়লোকদের ব্যাঙ্কে, তাদের

আত্মাহীন রূপবতী স্ত্রীদের দেহে, তাদের সুখশয্যায়, আহার্যে, পানীয়ে আর সিগারেটের ধোঁয়ায়। (আমিও সাম্যবাদী হয়ে যাচ্ছি নাকি!) টাকা চাই। উঃ, বেলা বাড়ছে, এবার যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, টাকা চাই—তপনের শ্মশানযাত্রার খরচ। পয়সা না হলে তুমি আগুনে পুড়তেও পার না (আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে)।

"দিলীপবাবু!"

"বলুন।"

"আপনার বন্ধু মরে আমার ঈর্ষাভাজন হয়েছেন।" (হ্যাঁ, তপন ছেলেটি প্রতিভাসম্পন্ন ছিল। আমি তার দু-একটা কবিতা পড়েছি। বর্তমান সভ্যতার আবরণতলে যে বর্বর আদিযুগ লুকিয়ে আছে তা সে বুঝতে পেরেছিল। ছেলেটির ক্ষমতা ছিল, আদর্শের জন্য, ন্যায়ের জন্য, প্রাণবলি দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো উন্মাদনা তার কবিতার ছন্দে ছিল। কিন্তু দুঃখ কি, ওরই মতো আরও অনেকে জন্মাবে)।

"কেন?" দিলীপের মনে আঘাত লাগিল, সে উত্তরের প্রত্যাশায় শঙ্করের দিকে চাহিল। জানি শঙ্কর, জানি যে তুমি কঠিনমনা, বহু দুঃখে তোমার জীবন তৈরী, তবু—তবু—মানুষের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করাতে তো লজ্জা নেই। নাঃ—দেরি হয়ে যাচ্ছে—

"কেন?—কারণ ডাকাতদের অত্যাচারের হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন।"

"কোন ডাকাত?"

"পৃথিবীতে ডাকাত তো এক রকমেরই।"

"কারা?"

"নিজেরা না খেটে পরের খাটুনির ফল যারা ভোগ করে তারা।"

দিলীপ হাসিল। সাম্যবাদী কথা বলছে। সব মানুষ সমান হও। কিন্তু সমান হবে কেমন করে? আগে মনকে তৈরী করতে হবে। তার জন্য শিল্পী চাই। নাঃ, দেরি হয়ে গেল। আমি ভগ্নদূত—সমর, দ্বিজেশকে খবর দিতে হবে (বেলা কত? আজ আর খাওয়া-দাওয়া হবে না। মা ভাববে,

বসে থাকবে। মেজদার জন্য কাল রাত্তিরে খাবার নিয়ে বসে ছিল। ঠিক, দাদাব কথা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে নিই—উঃ, দেরি হয়ে গেল। বড় গরম, সূর্যটা যেন মাথার কাছে এসে গেছে, ওর আলোতে অসংখ্য অদৃশ্য বীজাণু। (হয়তো যক্ষ্মার বীজাণুরাও উড়ে বেড়াচ্ছে—নিঃশ্বাস বন্ধ করব ?)—আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

"দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?" সে প্রশ্ন করিল।

"কে ? শেখর ?"

"হ্যাঁ।"

"কাল রাত্তিরে দেখা হয়েছিল। হাওড়ায় বসাকদের পাটের কলে স্ট্রাইক চলছে দুদিন ধরে, তারই জন্য মজুরদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।"

"ওঃ—"

"কেন ? আজ বাড়ি ফেরে নি ?"

"বোধ হয় না।" (আর দেরি নয়—)

"বিকেল নাগাদ তাহলে কারখানা থেকেই একেবারে ফিরবে।"

"যদি দেখা হয় একবার বলবেন বাড়ি যেতে।" (শবদেহ থেকে গন্ধ বেরুবে)।

"হয়তো দেখা হবে। আজ এক জায়গায় আমার সঙ্গে এখুনি দেখা হবার কথা।"

"আচ্ছা—আমি এখন যাই, আমায় আবার শ্মশানে যেতে হবে।"

"লোকের দরকার নেই তো ?"

"এখনও না, হলে খবর দেব।"

"আচ্ছা।"

দিলীপ একটি গলিতে ঢুকিল। খানিকক্ষণ তাহার ক্লান্ত পদক্ষেপ দেখা গেল, তাহার ছিন্ন চটির শব্দ কয়েকবার শোনা গেল, তাহার পরে সে একেবারে অদৃশ্য হইল।

শঙ্কর একবার গলিটির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া চলিতে লাগিল। তপন মরেছে। ছেলেটি ভালো ছিল। দিলীপ ছেলেটিও ভালো কিন্তু বড় বেশি স্বপ্ন

দেখে। স্বপ্নের যুগ চলে গেছে। আজকার যুগ লোহার যুগ, এখানে স্বপ্নের অবকাশ নেই। আজ স্বপ্ন দেখা মানে নিজেদের তিলে তিলে মেরে ফেলা। দিলীপের মধ্যে কতকগুলো গুণ আছে, মানুষকে ভালোবাসা তার মধ্যে একটি। কিন্তু তবুও বুর্জোয়ার রক্ত এখনও তার দেহের ভিতরে তাই সে স্বপ্ন দেখে, একটুতেই মুষড়ে পড়ে। শেখর অবশ্য তা নয়, ও নিজের রক্তকে অস্বীকার করেছে, হাতুড়ি আর হাতুড়ির আঘাতকে সে জানে, বোঝে। সে শ্রমিক। (তাই তো, কি করি? নেতারা কারারুদ্ধ হল, আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকলে তো চলবে না!) বাস্তবকে সে জানে, চেনে, দিলীপ ওরা বাস্তব জীবনকে এখনো ভালোভাবে দেখে নি। একদিক, অর্ধেক, একটি অংশ দেখলে চলবে না, তাতে অভিজ্ঞতা বিকৃত হবে। যেমন হয়েছে আজকালকার বেশির ভাগ সাহিত্যিকদের! ওরা মনোবিলাস করে! সুন্দর সুন্দর কথা আর অনুপ্রাসের সাহায্যে সাম্যবাদী কবিতা লেখে, সস্তা উচ্ছ্বাস-ভরা ন্যাকামির উদ্গার করে আমাদের সহানুভূতি জানায়। বাস্তবের নামে ওরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত সস্তা টনিক খেয়ে নিজেদের রতি-কামনা পূরণ করে। দিলীপ—তোমার কিন্তু তাহলে চলবে না (লোকদের মুখে-চোখে একটা উত্তেজনা দেখছি, কি বলাবলি করছে ওরা?)—তুমি বাস্তবের সমগ্র রূপকে দেখ।

"খবরটা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ হে, সুনীল এইমাত্র রেডিও শুনে এসে বলল।"

"কি হবে এবার, বুঝতে পারছ?"

"সেই পুরোনো কথা—১৯২০ আর ১৯৩০ সালের মতো।"

"যাই বল ভাই, এই সময়ে এই কাণ্ড আরম্ভ করা ভালো হল না।"

"যাও যাও, বাজে কথা বন্ধ কর—নিছক খেয়ে আর ঘুমিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?"

শঙ্কর চলিতে লাগিল। বাস্তবকে দেখ দিলীপ। তখন দেখবে তোমার উচ্ছ্বাস কমবে, ভাবালুতা উড়ে যাবে, ইস্পাতের ফলার মতো তোমার মন তখন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। বাস্তব! আমি তা জানি। বড় ভয়ানক তা। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে (এসব কথা বেশি ভাবা উচিত নয়)…বাবা.

মারা গেল। আমার বয়স তখন বছর পাঁচেক। বাবা কিছু রেখে গেল না। সামান্য মিস্ত্রী কি করে তা পারবে? তারপরে মায়ের সে এক যুদ্ধ আরম্ভ হল। অনাহার, দাসীবৃত্তি, ভিক্ষা। তারপরে একদিন—

—সেদিন বর্ষার রাত, ঝিরঝির করে সমানে বিষ্টি পড়ছিল। সকাল থেকে সেদিন কিছু জোটে নি, মা একেবারে অনাহারে। একবাড়িতে ভিক্ষে করে মা একটা শুকনো রুটি এনে আমায় দিল।

তা চিবোতে আমার কষ্ট হচ্ছিল।

মা বলল "কষ্ট হচ্ছে, নারে?"

পাঁচ বছরের গরিবের ছেলের মনের বয়স অনেক বেশি হয়। আমারও তাই ছিল।

আমি মাথা নেড়ে বলছিলাম, "না—চিবোতে ভালো লাগছে মা।"

মা আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল।

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। একদৃষ্টে মা আমার সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করছে।

"তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস ভোলা।"

আমি শুকনো রুটি চিবোতে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিলাম না।

খাওয়া হলে পর মা বলল, "এবার ঘুমোও বাবা।"

পেট ভরল না, তবু মায়ের কথামতো শুয়ে পড়লাম।

মা পিদিম নিভিয়ে বাইরে গেল। (মনকে সব সময় সংযত করতে পারি না কেন?) অনেকক্ষণ ঘুম এল না, ক্ষিদে প্রচুর ছিল কিনা। চোখ বুজে ইঁদুরগুলোর অন্ধকারে চলাফেরার শব্দ শুনতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম। মা ঘরে এল, সঙ্গে একটি লোক।

আমি জেগে আছি বুঝতে পারলে পাছে মা বকবে এই ভেবে চুপ করে রইলাম। মা ঘরে এসে পিদিমটা আবার জ্বালল।

একটুখানি চোখ খুলে (এখনও সেলিমের বাড়ি দূরে—আমার পুরোনো কথা ভাবা উচিত নয়—পুরোনো কথার জাবর কাটা দুর্বলতার লক্ষণ) তাকিয়ে দেখলাম লোকটির বয়স বছর ত্রিশেক। ভদ্রলোকই বটে।

লোকটি মায়ের একটা হাত ধরল। আমি চোখ বুজলাম। বস্তিতে কদর্য নগ্নতার মধ্যে আমি আমার পাঁচ বছরের জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তারি একটার আশঙ্কায় আমার ছোট মাথার পাতলা শিরগুলো দপদপ করে লাফাতে লাগল, কিন্তু কিছুই বুঝতাম না তখন। পাপ কি, পুণ্য কি, ন্যায় আর অন্যায়ে কি পার্থক্য, ধর্ম আর অধর্মে কতটা ভেদাভেদ তা বোঝবার মতো বয়স তখন আমার নয়। তবুও অন্তরে মনটা আমার ভারি হয়ে উঠল (আমি কি দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠি নি?), লোকটির আগমনে বিদ্রোহ করতে চাইল। তবু চুপ করেই রইলাম।

লোকটির কথা কানে এল, "বাতিটা নিভিয়েই দাও।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বাতিটা নিভিয়েই দিয়েছিল। সে দীর্ঘনিশ্বাসে আমার বুক আলোড়িত হয়ে উঠেছিল (নাঃ—আর কতদূর? কারখানাতে যেতে হবে বইকি।) বাইরে তখনও একটানা বিষ্টির শব্দ চলছে, রাত বেশ গভীর হয়েছে। মাঝে মাঝে বস্তির দু-একটা মাতালের গানের শব্দ ভেসে আসছে। ঘরের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে নিরুদ্ধনিশ্বাসে মাঝে মাঝে মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস আর লোকটির দুর্বোধ্য অস্ফুট-শব্দ শুনতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ কাটল। ঘরের মধ্যে এবার নামল স্তব্ধতা।

আবার পিদিম জ্বলল (বাস্তবের সমগ্র রূপ দেখ দিলীপ। অনুভব কর—মানুষেরা কি গভীর আগ্রহের সঙ্গে বাঁচতে চায়)।

তবু চোখ মেললাম না। ভয় লাগছিল।

হঠাৎ কানে এল টাকার ঝনাৎকার।

লুকিয়ে লুকিয়ে চাইলাম। দেখলাম মা মেঝের ওপর বসে আছে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো, অনাবৃত বক্ষ (যে বুকে আমি মাথা রেখে ঘুমোতাম, যে বুকের দুধ খেয়ে আমার হাড়-জিরজিরে দেহের মধ্যে প্রাণপাখি বেঁচে থাকত—নাঃ—এবার এ চিন্তা থামাতে হবে। হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যেবেলায়—)। পেছনের দেয়ালে তার ছায়াটা বড় হয়ে পড়েছে। পিদিমের শিখাটা কাঁপছে (আজই সন্ধ্যেতে মিটিং করতে

হবে) থরথর করে। (নাঃ কিছুতেই অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। সব মনে পড়ছে)।

হঠাৎ মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে মা চাপা গলায় বলল—"ভগবান" (আমিও কতবার অমনি ডেকেছি! অবশ্য ছোটবেলায়। যদি তখন বুঝতে পারতাম যে ভগবান নেই তবে মাকে হয়তো বলতাম। তা তো বড় হয়ে বুঝলাম! আর এও বুঝলাম যে আর কিছু না থাক মানুষ আছে)।

এর পর থেকে খাওয়া-দাওয়া ভালোই হতে লাগল। কাপড়জামাও দু-একটা পরতে লাগলাম। প্রায়ই রাতের বেলায় সেই পুরোনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হত। আমি ঘরের এককোণে শুয়ে নানারকম কথা ভাবতাম—এ-লোকগুলো কারা? মা কেন অমন করে? কেন লোকগুলো মাকে টাকা দেয়। (ভেবে নাও মন—সব কথা ভেবে নাও—তোমায় কিছুতেই থামাতে পারব না)।

শেষে একদিন আর না পেরে (এই যে গলিটা এসে গেছে। এই গলির শেষেই সেলিমের বাড়ি।) মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা—"

"কি রে?"

"তোমার কাছে রাতের বেলায় কারা আসে মা? তারা তোমায় টাকাই বা দেয় কেন?"

মায়ের মুখ হঠাৎ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল, ঠোঁট দুটো কয়েকবার কেঁপে উঠল, আমার দিকে একবার তাকিয়েই মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উঠে চলে গেল। (পরে বড় হয়ে বুঝেছিলুম যে মা আড়ালে কাঁদতে গিয়েছিল)। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

সেদিন রাতে আর কেউ এল না।

শেষরাতে হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। মাকে ডাকলাম। সাড়া পেলাম না। বিছানা হাতড়ে মায়ের পরিচিত দেহের স্পর্শ পেলাম না। উঠে ভালো করে চেয়ে দেখলাম যে রান্নাঘরে পিদিমটা জ্বলছে।

সে ঘরে গেলাম। গিয়েই আর্তনাদ করে উঠলাম। চালের একটা বাঁশে শাড়ি বেঁধে মা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। আমার প্রশ্নের জবাব মা আত্মহত্যা করে দিয়েছে। ভয়ে গা হিম'হয়ে গেল। চিৎকার করার চেষ্টা করেও কিছু আর মুখ দিয়ে বেরোল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে কেবল দেখতে লাগলাম (সেলিম বাড়ি আছে তো?) মায়ের জিভটা বেরিয়ে এসেছে, রক্তজবার মতো দুটো বড় বড় চোখের স্থিরদৃষ্টি যেন আমার দিকে নিবদ্ধ। শেষরাতের গভীর ঘুমে সারা বস্তি অচৈতন্য, কোনোও শব্দ বাইরে নেই, ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব। দেখতে দেখতে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

তারপর কোলাহল, পুলিশ, শবব্যবচ্ছেদ, জেরা—কতরকম কি। গভর্নমেণ্ট আমায় এক অনাথ আশ্রমে দিল। দিন কাটতে লাগল, অত্যাচার নির্যাতনের মধ্যে বড় হতে লাগলাম, শেষে একদিন ম্যাট্রিক পাশ করলাম। কিন্তু ভুলতে পারলাম না যে, মায়ের দেহের বিক্রয়লব্ধ অর্থে বেঁচে আছি (মা তোমার তুলনা নেই)। তাই একদিন নিমকহারামি করে বেরিয়ে পড়লাম (তোমায় ধন্যবাদ মা, তুমিই আমায় কর্মের পথে এগিয়ে দিয়েছে, তোমার দেহ-বিক্রয়কে আমি সার্থক করে তুলব)। যে বিষ আমি পান করেছি তার ক্রিয়া আরম্ভ হল! কিন্তু আমি কাউকে ছাড়ব না। সাবধান —হে ধনবান, ভাগ্যবান, সুখী লোকেরা—তোমাদের কাছ থেকে আমি আমাদের বহুযুগের প্রাপ্য সুদ সমেত আদায় করব! তাইতো আমরা কাস্তেতে শান দিচ্ছি, হাতুড়িতে আঘাত দিয়ে দিয়ে আরও শক্ত করছি,— তোমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।…(মায়ের মুখটা এখনও মনে পড়ছে), আমার পথ শেষ হয়ে এসেছে (শাড়ির ফাঁসে ঝুলন্ত অবস্থায় মায়ের শরীরটা একটু একটু করে দুলছিল), এই যে সেলিমের বাড়ি। সেলিম আমাদের দলের একজন উৎসাহী কর্মী। এবার থামি কমরেড মন, তুমিও থাম।

"সেলিম ভাই আছ?" শঙ্কর ডাকিল।

সঙ্কীর্ণ গলির প্রান্তে কয়েকটি ভাঙা বাড়ির একটিতে সেলিম থাকে। ঘরগুলি পাকা, টিনের চাল দেওয়া। বাড়িঘরগুলো বড় নোংরা, গলির একপাশে ছাইয়ের স্তূপের উপর নানারকমের আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া আছে।

সেলিম ভিতরে ছিল, শঙ্করের এক ডাকেই সে সাড়া দিল, "আজ্ঞে আছি।"

বাহিরে আসিয়া বারান্দার উপরে বিচরমান দুইটি মুরগীকে নিচে তাড়াইয়া দিয়া সে হাসিয়া বলিল, "সেলাম কমরেড।"

"সেলাম ভাই।"

একটি ভাঙা মোড়া একপাশে পড়িয়া ছিল, তাহা হাত দিয়া একবার মুছিয়া সেলিম বলিল, "বসুন।"

শঙ্কর বসিল।

"কি করে জানলেন যে আমি আজ বাড়ি আছি?" সেলিম প্রশ্ন করিল।

"লতিফের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল আজ বোধ হয় তুমি কারখানায় যাবে না। কেন?"

"আজ শরীরটা ভালো নেই।"

"কারখানার খবর কি?"

"খবর এখন ভালোই, ধর্মঘটের পর থেকে মালিকেরা একটু ভয় পেয়ে গেছে।"

শঙ্কর হাসিল, "বেশ—বেশ।"

"কমরেড—"

"বল।"

"গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ—এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আমরা কী করব?"

"কাল ধর্মঘট করতে হবে।" (হ্যাঁ—একটা কাজ ঠিক করা হল—কিন্তু তারপর?)

"আমরাও?"

"নিশ্চয়ই—সব মজদুরেরাই করবে। কেন সেলিম, তুমি দেশকে ভালোবাসো না?" (দিলীপ প্রশ্ন করেছিল।)

"কি যে বলেন কমরেড, যে মাটি আমার দাঁড়াবার জায়গা, রুটি আর পানি দিয়েছে তাকে না ভালোবাসা মানে তো মাকে অপমান করা।"

"ঠিক বলেছ সেলিম। কংগ্রেস এবার লড়াই আরম্ভ করবে আর

কংগ্রেসের এই লড়াই আমাদেরও লড়াই, কারণ আমরাও স্বাধীনতা চাই। সুতরাং তৈরি থেক, আর তোমার লোকেদেরও তাই বল। যদি পার তবে আজ সন্ধ্যাবেলায় মিটিং-এ এস।"

"আচ্ছা কমরেড।"

শঙ্কর উঠিল।

"চললেন?"

"হ্যাঁ, এই বলতেই এসেছিলাম। ভালো কথা—শেখরবাবু তোমার কাছে এসেছিলেন? এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা ছিল।"

"হ্যাঁ—ঘণ্টাখানিক আগে এসেছিলেন, কিন্তু মহবুবের মুখে যেই খবর পেলেন যে পাটের কলের মালিকেরা কয়েকজনকে হাত করেছে অমনি তিনি উমেশের ওখানে গেলেন।"

"ওঃ—আচ্ছা।"

"কি করবেন তবে?"

"আমিও যাচ্ছি ওখানে, দেখি স্ট্রাইক কি করে বন্ধ হয়। আচ্ছা চললাম সেলিম।"

"ইন্‌কিলাব—"

"জিন্দাবাদ।"

দ্রুতপদে শঙ্কর অগ্রসর হইল। তাহার দীর্ঘদেহের গতিতে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বাতাস আন্দোলিত হয়, গলির ইটবাঁধানো পথ কাঁপে। চলিতে চলিতে নিজের মনে সে মাথা নাড়িল। হ্যাঁ—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। (কোনো একজন বিশিষ্ট নেতা মফস্বলে একবার বলেছিল যে, বিপ্লবের দীর্ঘজীবন কামনা করা মানে মনুষ্য সমাজের ধ্বংস কামনা করা। মূর্খ নেতা—নতুন কথা বলে বাহবা পেতে চেয়েছিল। বিপ্লব মানে কু-সংস্কার, অন্যায়, অত্যাচারের উচ্ছেদ করা, সমস্ত মানুষকে হত্যা করা নয়।) সমস্ত অন্যায় অবিচার আর লোভ নির্মূল হোক। স্ট্রাইক বন্ধ করবে? দেখা যাক। ভুঁড়িওয়ালা মালিকেরা মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে। মৃত্যু। আমার দুঃখ নেই। আমি শেখর নই (সে এখন উমেশের ওখানে কী

করছে ? উমেশটাই তো আসল পাজী), আমি দিলীপ নই, আমি বেঁচেছি মায়ের বেশ্যাবৃত্তিতে, তাই আমি মানুষকে ভালোবাসি না। আমি ঘৃণা করি। তবুও কেন তাদের জন্য খেটে মরছি। (মা তোমার আত্মার ক্রন্দনই আমাকে এই মূর্খ মানুষদের সেবায় নিয়োজিত করেছে)। মালিকেরা—এবার ট্রেঞ্চের আড়ালে লুকোও, আর রক্ষা নেই। (নাঃ, ভাবপ্রবণতার কলঙ্ক আমাকে একদিন লোকেরা দেবে। সাবধান কমরেড।)

প্রশস্ত রাজপথে শঙ্কর বেরিয়ে এল। উমেশের বাড়ি আর দশ মিনিটের রাস্তা। উমেশ পাটের কলের একজন মিস্ত্রী।

চলিতে চলিতে শঙ্কর শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে।

সে পিছন ফিরিয়া দেখিল যে রাস্তার অপরপার্শ্ব হইতে চৌবে তাহাকে ডাকিতেছে। চৌবে যুক্তপ্রদেশের বাসিন্দা, ট্রাম কোম্পানিতে সে কাজ করে।

শঙ্কর দাঁড়াইল।

রাস্তা একটু খালি হইলে চৌবে দৌড়াইয়া তাহার নিকট আসিল।

"কি ব্যাপার চৌবে ?" শঙ্কর হাসিয়া বলিল।

চৌবে ভালো বাংলা বলিতে পারে। সে হাসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ দরকার ছিল।"

"কেন ?"

"আমাদের ব্যাপারটা এখনও ভালো করে মেটে নি।"

"আবার কি হল ?"

"সে অনেক কথা, সাহেবরা আবার গোলমাল করছে।"

"বলতে কি দেরি হবে ?" (উমেশের বাড়ি আমায় এক্ষুণি যেতে হবে।)

"তা একটু হবে।"

"তাহলে এখন থাক ভাই। বিকেলে আমার ওখানে এস, আজ মিটিংও আছে, সেখানেই সব শুনব।"

"কিসের মিটিং ? বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে ?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

আর মিনিট পাঁচেক পরে শঙ্কর উমেশের বাড়ি পৌঁছাইল।

উমেশ বাহিরের ঘরে শেখরের সহিত কথা বলিতেছিল।

শঙ্করকে দেখিয়া উমেশ সহাস্যে বলিল, "এই যে শঙ্করবাবুও এসেছেন! আমার কি সৌভাগ্য—আসুন—বসুন।"

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া উমেশের দিকে চাহিল। আশ্চর্য রকমের ধড়িবাজ এই উমেশ। মুখে মিষ্টি কথা, অন্তরে ধারালো ছুরি।

শেখর বলিল—"যাক, তুমি এসে ভালোই করেছ।"

"ব্যাপার কি শেখর?" (শেখরকে পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। বড্ড বেশি খাটে ছেলেটা।)

"ব্যাপার?" শেখর হাসিল। শেখরের হাসি বড় সুন্দর। ঈষৎ তাম্রাভ সুন্দর মুখখানা তাহার ঝকঝক করিয়া উঠিল, সে বলিল, "ব্যাপার আবার জটিল হয়ে আসছে। কাল থেকে নবীন, আসরফ, লক্ষণ সিং আরও জন দশেক নাকি কাজে যাবে। মালিকেরা তাদের হাত করেছে।"

"বটে!" শঙ্কর উমেশের দিকে চাহিল। এই উমেশই এর মূলে আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু আমাদের ব্রত ভঙ্গ করাবে এই উমেশ! ঐ বেঁটে, মোটা, কুৎসিত লোকটা? ঐ অতি নগণ্য লোকটা?

শঙ্কর উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা সত্যি নাকি উমেশ?"

শঙ্করের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত উমেশ দৃষ্টি মিলাইতে পারে না। সে শেখরের দিকে মুখটা ফিরাইয়া উত্তর দিল, "আমি ঠিক বলতে পারি না শঙ্করবাবু, তবে এইরকমই একটা খবর পেয়েছি।" (শালা কি রকম তাকায়! ভয় করে।)

শঙ্কর একটু মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, "আমার কিন্তু ধারনা অন্যরকম উমেশ। আমার বিশ্বাস এ খবর তুমিই দিয়েছ।"

উমেশ বিস্ময়ের ভান করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কোন শালা বলে (শালা ঠিক ধরেছে)—মাইরি বলছি শঙ্করবাবু, আমি কিস্যু জানি না।"

(শালারা সব লেবর পার্টি করেছে। আমাদের কাজ না করে যে পয়সা মারা যাচ্ছে তা কি তোরা দিবি ?).

"চুপ কর উমেশ, বাজে কথা শুনতে ভালো লাগে না। আমি জানি তুমি এর মধ্যে আছ।"

"বাঃ রে—আমি নিজে যাচ্ছি না এমন কি সকলকে যেতে বারণ কবছি—আর—"

"সব মিথ্যে কথা।"

"আমি কেন একাজ করতে যাব? যদি সত্যি এই হয়ে থাকে তবে মালিকেরা নিজেরাই বলেছে।" (আজ যদি আমার চাকরি যায় তবে কি তুই আমায় খাওয়াবি রে হারামজাদা ?)

"মালিকদের সে সময় নেই। তাদের মুখপাত্র তো তুমি। কত টাকা এর জন্যে পেয়েছ ?" (আমাদেব গতিরোধ করতে কেউ পারবে না। কিন্তু উমেশ তুমি কি মানুষ না ?)

"না শঙ্করবাবু, আমার এসব কথা ভালো লাগছে না। বাড়িতে বয়ে এসে অপমান করবেন নাকি ?" (এই কদিন স্ট্রাইক হয়েছে, একফোঁটা মদ ভালো করে গিলতে পারি নি। অন্ধকারে বাতাসীর নরম শরীর, নরম বুক—)

"তোমায় অপমান কর্তে আসি নি ভাই, বোঝাতে এসেছি। তুমিও মজুর। তোমারই চারজন সঙ্গীকে তোমাদের মালিকেরা বিনা দোষে তাড়িয়েছে—একথাটা ভুলো না ভাই।"

জিভ বাহির করিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে উমেশ বলিল—"কখনও না—আমি কি মানুষ না শঙ্করবাবু!" (তার নরম শরীরের উপর দিয়ে হাত বুলোও—হাত বুলোও, চুমু খাও, আঃ—শালারা বড় দিক করছে)।

"আমার তাতে সন্দেহ আছে (তুমি কুকুর)। যাই হোক—আমরা যাচ্ছি, তবে তোমায় ভাই মিনতি করে যাচ্ছি যে তুমি দলের বিরুদ্ধে যেও না। তুমি যদি এই উপকারটুকু কর, তবে তোমার কথা আমাদের মনে থাকবে।"

শেখর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ উমেশ তাই কর। তাছাড়া একটু দুঃখে একটু ত্যাগে কষ্ট পাও কেন? তোমাদের জিনিস, তোমাদের অধিকার অন্যে ভোগ করছে দেখে তো দুঃখ পাও না ভাই!"

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—"আর যদি এ উপকার না করে অপকারের চেষ্টাই কর তবে তোমার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।" তাহার মুখে-চোখে একটি স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া সে ডাকিল—"চল শেখর।"

"চল। চললাম উমেশ, মানুষ হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে তোমার যা কর্তব্য তা কর ভাই।"

উমেশ মাথা নাড়িল, "নিশ্চয়ই, তা বলতে—(যাঃ—ভাগ্—শালারা জ্বালিয়ে গেল। আজ ছোটবাবু পাঁচটা টাকা দিয়েছে। একবোতল আগুন আর বাতাসী। ব্লাউজটা খুলে ফেল মাগী—থাক শালারা গেছে)।

ভিতরের দরজা খুলিয়া সে আস্তে আস্তে ডাক দিল, "এবার বাইরে এস সাম্‌সু।"

একজন লম্বা, বিরাট দেহ মুসলমান ভিতর হইতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে লুঙ্গি, চোখমুখে কসাই-এর মতো ক্রুর ভাব। বয়স আটাশ।

"দেখলে তো?" উমেশ প্রশ্ন করিল।

"হাঁ জী।"

"ঐ শেখরবাবুর ওপরেই নজর রেখ, এই আসল কাজ করে। হয়তো এক্ষুনি (কোলে এসে বসবে বাতাসী) মিলের দিকে যাবে, এবার তুমি তোমার কাজ কর।"

"আচ্ছা—সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

সে দরজার আড়াল হইতে শেখর ও শঙ্করের গমন পথের দিকে চাহিল।

বাহিরে চলিতে চলিতে শঙ্কর বলিল—"দেখলে শেখর, লোকটা কত বড় পাজী?"

শেখর চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িল।

"কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই, যদিও খাটুনীটা একটু বাড়ল।"

"হুঁ।" (মানুষেরা বুঝেও বোঝে না কেন ?)

"আজকে সন্ধ্যেবেলায় আমার ওখানে একটা মিটিং হবে শেখর।"

"আচ্ছা।" (মানুষেরা নিজেদের ভালো বোঝে না কেন ?)

"বুঝতে পেরেছ কেন ?"

"কংগ্রেস।" (এখন আমি কি করব ?)

"হ্যাঁ।"

"ভালো কথা, তুমি কাল রাত্রে বাড়ি যাও নি ?"

"না।" (স্ট্রাইকটা ব্যর্থ হলে বড় ক্ষতি হবে।)

"কোথায় ছিলে ?

"হরনামের ওখানে।"

"আজ একবার বাড়ি যেও, ওঁরা চিন্তিত আছেন।"

শেখর হাসিল। বাড়ি! মা, উমা, দিলীপ, বাবা, গোরা—দাদা কোথায় ? বাড়ি থাকলেই কি বাড়িতে থাকা যায় ? পৃথিবীতে যে দারিদ্র্য আছে, অসাম্য আছে। ওরা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। হাঁ—কি করি এখন ?

"কি ভাবছ ?" শঙ্কর প্রশ্ন করিল। শেখর বড় শ্রান্ত! শেখর আমার ডান হাত, আমার বন্ধু। ওর মধ্যে প্রমিথিয়ুসের রক্ত আছে।

"ভাবছি যে আমি এখন একবার হাওড়ায় গিয়ে কেশোলালের ওখানে ওদের ডাকিয়ে এনে বোঝাব।"

"এক্ষুনি ? (কথাটা মন্দ বলে নি। কিন্তু বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে শেখরকে। কোঁকড়ানো চুলগুলোর উপরে ধূলোর পাউডার জমেছে, কাপড় জামা ময়লা, ওর বাড়ি যাওয়া উচিত।) বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে তারপরে যেও।"

"উঁহু—দেরি হয়ে যাবে। বাড়িতে একেবারে রাতেই ফিরব।"

"যা ভালো বোঝ কর, তবে শরীরকে বেশি অবহেলা করো না।"

তাহলে আমি এখন অন্যদিকে যাচ্ছি কারণ কালকের স্ট্রাইকের জন্য

একটা ইস্তাহার আজকেই লিখতে হবে, ছাপাতে হবে, বিলোতে হবে তারপরে মেম্বারদের আজকের মিটিং-এর জন্য খবরও পাঠাতে হবে।"

"বেশ।"

বড় রাস্তায় পৌঁছিয়া শঙ্কর বাঁদিকে পা দিল।

"চললাম, তাহলে।"

"আচ্ছা।"

"মিটিং-এ এসে সব জানাবে।"

"হ্যাঁ।"

জনতাকে ভেদ করিয়া শঙ্করের দীর্ঘ দেহ ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল।

শেখর রুমাল বাহির করিয়া ললাট মুছিল। বড় গরম। আকাশটা ইস্পাতের ফলার মতো। অমনি ক্ষুরধার, আলোকিত জীবন চাই। রুমালটা ময়লা হয়ে গেছে, ঘামের গন্ধ আসছে। তেষ্টা পেয়েছে।

একটা বাস ধরতে হবে। একটা ট্রাম চলে গেল। এই বাসটা কোথায় যাবে? ওঃ—পার্ক সার্কাস। নাঃ - দাঁড়াই! কত লোক। এই জনতার মধ্যে দাঁড়ালে আমার যেন কেন ভারি ভালো লাগে। কত রকমের সব জীবন্ত মানুষ আব তাদেব প্রত্যেকের অন্তবে সেই অপরূপ অগ্নি শিখা। আত্মা। কিন্তু তার কথা কেউ শোনে না। শঙ্কর আমাকে বিশ্বাস করে না! আমি করি। আত্মাহীন হলে নিছক একটা নিয়মিত গণ্ডী আর প্রণালীতে জীবন সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিহাস পড়, ভাব। কত বৈচিত্র্য, কত নব নব সামাজিক পদ্ধতির উদ্ভাবন, কত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সংঘর্ষ। অবশেষে এই সাম্যবাদ। আত্মা না থাকলে এ সম্ভব হত না। পৌরাণিক দেবতাদেরও মাথায় এ জিনিস ছিল না। আমরা দেবতাদের চেয়েও বড় হব। পৃথিবীর সব মানুষ সমান হও (একটা বাস আসছে) কিন্তু মানুষেরা বুঝেও বোঝে না। থাম। হ্যাঁ, বাসটা হাওড়া যাবে। বাঃ, কি সুন্দর ঐ মেয়েটি, অপূর্ব। কিন্তু বোন, তোমার ঐ শাড়ির মধ্যে বহু শ্রমিকের পেশী সঞ্চালনের ইতিহাস আছে। তোমার ঐ গয়নার

মধ্যে আছে খনি-গর্ভস্থ ঘর্মাক্ত ক্লান্ত মজুরদের লোভ। লোভ নয় অধিকার। বোন, দিন শেষ হয়ে এল। তোমার ঐ শাড়ি টুকরো টুকরো করে সমস্ত নগ্ন মানব গোষ্ঠীকে বিলিয়ে দাও (বাসটা থেমেছে—হ্যাঁ, আমার হাত তোলা দেখেছে)। আজ এই নিষ্করুণ রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন, এই ব্যস্ত জনতা, এই কোলাহল আমার ভালো লাগছে। আমি পৃথিবীর সঙ্গে, মানুষেব সঙ্গে ভালোবাসায় পড়ে আছি (বড় তেষ্টা পেয়েছে)—

"সেলাম বাবুসাহেব।"

সেই লুঙ্গি পরা বিবাটকায় মুসলমানটি পশ্চাৎ হইতে বলিল।

শেখর তাকাইল, "কি ভাই?" (একে তো কখনও দেখি নি।)

সামসু বলিল, "আপনার সঙ্গে দুএকটা বাৎ আছে হুজুর।"

"বেশ তো—বলো!" (কি কথা বলবে? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ কম্‌রেড।)

"একটু এদিকে আসুন না।"

"চল।" (লোকটা গুণ্ডা—বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঐ আকাশ আমায় প্রেরণা দিচ্ছে—অমনি অবাধ, মুক্ত জীবন চাই—)

তাহার ফুটপাথের একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সামসু দুটি বিড়ি বাহির করিল।

"লিন্ বাবু—"

"না ভাই—আমি বিড়ি খাই না।" (ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে। কিন্তু কি ব্যাপার? কেন?)

সামসু নিরুত্তরে একটি বিড়ি পকেটে রাখিয়া অপরটি ধরাইল। এক টান দিয়া নাক দিয়া ঘন ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একবার বিড়িটার দিকে চাহিয়া আশেপাশে তাকাইল।

শেখর অধৈর্য বোধ করে। বাস্‌টা চলিয়া যাইতেছে।

"কি বলবার শীগগির বলো মিঞা সায়েব, আমার বাস চলে যাচ্ছে।"

"যাক না—" সামসু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যে একটা পাশবিক ভাব। যে পাশবিকতার মধ্যে বিবেক নাই, যুক্তি নাই, দয়া নাই।

"যাক্ না—আরও আসবে।" সে বলিল।

"কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাবে ভাই।" (তুমি গুণ্ডা তবু তোমাকে আমি ঘৃণা করব না। তুমি বিষাক্ত সমাজের ফল—তাই তোমার প্রতি তো আমার সহানুভূতি আরও বেশি বন্ধু।)

"কোথয় যাচ্ছেন আপনি?"

"সে খোঁজে তোমার দরকার?"

"একটু আছে। যাকগে—আমি জানি, আপনি হাওড়ায় যাচ্ছেন।"

"তাতেই বা তোমার কি?"

সামসু একটু হাসিয়া আবার চারিদিকে চাহিল, তারপরে বলিল—"আপনি যদি নিজের ভালো চান তবে সেখানে যাবেন না।"

শেখর হাসিল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। কিন্তু যা অন্যায় নয় তাতে ভয় কি?

সে বলিল—"গেলে কি হবে?"

"ভালো হবে না বাবুসাব। আর হ্যাঁ—এখন গিয়ে তুমি যদি নবীন, আসরফ—এদের কিছু বলো তাহলে আরও খারাপ হবে।"

"কি খারাপ হবে?"

একটি বিশেষ ইঙ্গিত করিয়া সামসু বলিল—"জান্ যাবে।"

"বটে।"

সামসু মাথা নাড়িল। হঠাৎ সে গম্ভীরকণ্ঠে চোখ পাকাইয়া বলিল—"খবরদার জী—সামসু মিঞার কথা মতো চলো—নইলে আখের ভালো হবে না।"

"আচ্ছা দেখা যাবে, এখন তুমি যাও।"

"আমি তো তোমার পিছনে পিছনে যাব।"

"বেশ, তাহলে এস। আমি তোমায় ভয় করি না, আর কেনই বা করব ভাই? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি। আচ্ছা চললাম, তোমার ইচ্ছে হয় বাধা-দিও।" (ভয়! যতক্ষণ আমার মধ্যে এতটুকুও জীবনী-শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার আদর্শ থেকে সরে

দাঁড়াব না। একটা গুণ্ডার ভয়ে, একটা ধারাল ছোরার আঘাতের ভয়ে আমি পালাব! আমার জন্ম তো এই কাজের জন্যই।)

একটি বাস্ আসিয়া দাঁড়াইল। শেখর তাহাতে উঠিয়া বসিল। একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মুসলমান গুণ্ডাটি ভিড়ে মিশাইয়া গিয়াছে।

বাস্ চলিতে লাগিল।

শেখর হাসিল। আমায় ভয় দেখাচ্ছে! শেখর, তুমি কি ভয় পেয়েছে? এমনি কতো ভয় আবও তোমায় সকলে দেখাবে; কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত ঝড় তোমার গতিরোধ করে দাঁড়াবে, তোমার সাধনাকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করবে, তোমার স্বপ্নকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করবে, তোমায় আদর্শচ্যুত করতে প্রয়াস পাবে। স্বপ্ন ভেঙে ফেলবে! না থাক এসব কথা। কিন্তু বড় ভালো লাগছে এই মধ্যাহ্নের রূপকে। এই মধ্যাহ্নের ভৈববরূপ, এই কর্মব্যস্ত সংসার, এই সমস্ত লোক, ঐ আকাশ, ঐ সূর্য, ঐ বড় অট্টালিকাগুলি, ঐ ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফেব তার, এই গাড়ি, এই গতি আর নিজেকে। একটি অপরূপ যোগাযোগ আছে এই সকলেব মধ্যে। এই সব কিছুই একটি বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বিচিত্র! কিন্তু বিচিত্রতম হবে সাম্যবাদে। একবার ভাব শেখব—কেমন হবে সেদিন যেদিন সব মানুষের অধিকাব হবে সমান। ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, আনন্দ হয়। মুক্ত মানুষের পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। তাদের কথাবার্তাও বেশ শুনতে পাচ্ছি। কমরেড? তুমি কে! আমি মানুষ। কোন দেশের লোক? পৃথিবীর। কোন জাতি? মানুষ। কোন ধর্ম? সাম্যবাদ। তুমি আর্য, অনার্য, মঙ্গোলীয়ান, না নিগ্রো? আমি মানুষ, আমাব চামড়ার নিচে রক্ত আছে—টকটকে লাল রক্ত। কারা বলেছে এসব কথা? কারা তারা? আমি, আমার সামনের ঐ লোকেরা, আমাদের মতো কোটি কোটি লোকেরা। আমার মস্তিষ্কের কোটরে, হৃদয়ের নিভৃতে, কল্পনার কুঞ্জে এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে, সেই ভবিষ্যৎ যুগের মানুষেরা সব কথা বলছে। তখন নাজিবাদ, ফ্যাসিস্তবাদ, আর সাম্রাজ্যবাদের ফসিল যাদুঘরের এককোণে অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকবে। ছুটির দিনে ছেলেমেয়েরা তা দেখে হাসবে। ছেলেমেয়েদের

হাসির শব্দ ভেসে আসছে। তাদের হাসির মধ্যে জীবনস্রোতের উদ্দাম আবর্ত। যুবতীদের মিষ্টি কথার টুকরো বাঁশির সুরের মতো কাঁপছে। তাদের কর্মকুশল, কঠিন অথচ পেলব দেহে সৃষ্টির নিমন্ত্রণ, চোখে নিঃসঙ্কোচ আদিম রহস্য। একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চল কম্‌রেড। সব বদলে গেছে। দারিদ্র্য নেই, নগ্নতা নেই, অনাহার নেই, শীতকাতর কান্না নেই। শেষরাতের দুঃস্বপ্নের মতো তারা সব নতুন জীবনের সূর্যালোকে পুড়ে গেছে (যদিও থাকে তবে সে একজনের নয়—সকলের)। পৃথিবী থেকে তখন আমরা ছুটব মঙ্গলগ্রহে, শনিগ্রহে—অজ্ঞাত সৌরলোকের অন্তহীন পথে অনন্ত গ্রহলোকের মধ্যে, তখন আমরা প্রচার করতে ছুটব আমাদের কথা—। আঃ—কি আনন্দ লাগে একথা ভাবতে! কিন্তু কবে? তার আগে কত কাজ করতে হবে। উঃ বড় ভিড়—একি! বাস্‌টা যে থেমে গেল! সামনে বড় ভিড। কি হয়েছে? আহা একজন লোক মোটর চাপা পড়েছে। লোকেরাও নামছে—আমিও নামি—

বাস্‌ হইতে নামিতে গিয়াই শেখর দিলীপকে দেখিতে পাইল।

"কোথায় যাচ্ছিস রে দিলীপ?"

দিলীপ দাঁড়াইল, শেখরের দিকে চাহিল, "বাড়ি যাচ্ছি।"

"ওঃ—আচ্ছা (লোকেরা আহত লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে) তাহলে মাকে বলে দিস যে আজ রাতে বাড়ি ফিরব।"

"আচ্ছা।" দিলীপ ক্লান্তপদে আবার অগ্রসর হইল।

শেখর তাহার গমন পথের দিকে চাহিল। দিলীপটাকে বড় রুক্ষ দেখাচ্ছে, এখনও খায় নি বোধ হয়। মায়ের হাতে কি পয়সা নেই?

"দিলীপ—শোন তো—"

দিলীপ ফিরিয়া আসিল।

"কি বলছ?"

"খাওয়া-দাওয়া সারিস নি এখনও, বেলা তো অনেক হয়েছে।"

"হ্যাঁ—আজ একটু দেরি হবে।"

"কেন—"

"তপন মারা গেছে—শ্মশানে যেতে হবে।" (মোটর চাপা পড়ে লোকটা কি মরে গেল নাকি ?)

"তাই নাকি! আহা—যাকগে—তবু খেয়ে-দেয়ে বেরোস (মৃত্যু তো একটা ঋতু পরিবর্তন—তাতে দুঃখ কি ?)।"

"হুঁ—" (দাদার কাছেও জীবনটাই বড়—কিন্তু আমার কাছে মৃত্যুও বড় কেন ?)

"আর শোন···মায়ের হাতে বোধ হয় পয়সা-টয়সা তেমন নেই, এই দুটো টাকা মাকে দিস।"

"আচ্ছা", দিলীপ টাকা দুটো পকেটে রাখিল, "তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?"

"আর বলিস কেন—হাওড়া—স্ট্রাইকটার ব্যাপার নিয়ে।"

"কারখানায় যাবে না ?"

"আজ ছুটি নিয়েছি।"

"ওঃ—আচ্ছা আমি যাই।"

বাস্‌-কন্‌ডাক্‌টারের ডাক শোনা গেল—"আইয়ে বাবুলোক—জলদি উঠিয়ে—"

"আচ্ছা যা ভাই।"

শেখর বাসে উঠিল।

বাস ছাড়িল। পেট্রোলের ধোঁয়া—একটা তিক্তমধুর উগ্র গন্ধ। কন্‌-ডাক্‌টারের ডাক শোনা যায়—"আইয়ে—হ্যারিসন রোড—হাওড়া—আইয়ে—"

দিলীপ চলিতে লাগিল।

"তা—জা—খবর—কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার—দুপয়সা"—একটি ছোকরা চিৎকার করিয়া গেল।

দিলীপ হাসিল। খবর আর 'তা—জা' নয়। আমি কি কিছু ভাবছিলাম ? তপন। শ্মশান। লোক চাই। বীণা। 'Lady, shall I lie in your lap ?' বীণা। ভালোবাসা। উপন্যাস। 'জগৎসিংহ, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তুমি হাসছ দিলীপ ?

"তা—জা—খবর—কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার—"

দিলীপ চলার বেগ বাড়াইয়া দিল। নেতারা কারারুদ্ধ। জেলখানার দেওয়ালগুলো বড় উঁচু। নিউ মুভ্মেণ্টে শিল্পী, তোমার কাজ কি? সুখস্পর্শ শব্দের চর্বণ—প্রেয়সীদের রক্ত ওষ্ঠের দার্শনিক তথ্য? সহস্র সহস্র লোক চিৎকার করবে—'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।' চল্লিশ কোটি ক্রীতদাস প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে উচ্চারণ করবে 'ভারত স্বাধীন হোক।' ক্রীতদাস। আইন করেও কিছু হয় নি। ক্রীতদাসের সংখ্যা কমে নি। তা কমবে ক্রীতদাসেরা আইন করলে। উঠে দাঁড়াও, মূর্খ ক্রীতদাসের দল। আমার মন ভেসে চলছে। সাঁতরে পার হও কালসিন্ধুর কৃষ্ণ-ঊর্মি। ঢাকের বাদ্য বাজছে। এক তালে। তালে তালে ক্রীতদাসেরা দাঁড় বাইছে। নীলাম্বুর চঞ্চল জলে আর একটু চাঞ্চল্য জাগে! কিন্তু সে কতক্ষণ? ক্রীতদাসের ক্লান্ত আত্মার শিহরণ দাঁড়ের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে লবণাক্ত হয়। মন-বিহঙ্গ, কালসিন্ধুর কালো জলে ভেসে চল। সারি সারি নগ্ন-গাত্র। সারি সারি কালো মানুষ আর স্ত্রীলোক। তাদের চোখে দুর্গম অরণ্যের অন্ধকার। তাদের বক্ষে আদিম পৃথিবীর মুক্ত উল্লাস। কিন্তু তারা ক্রীতদাস। বাতাসকে আহত করে চাবুক গর্জন করে ওঠে। তাদের পিঠের কালো চামড়া ছিঁড়ে লাল রক্ত পড়ে। ক্রীতদাসেরা মরে নি। চল্লিশ কোটি ক্রীতদাস—তোমরা এবার উঠে দাঁড়াও। মুক্তি চাইলেই পাওয়া যায়। শিল্পী —তুমি এদের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগাও। তপনটা মারা গেছে। আঃ—চিলের ডানাটা ঝলসে উঠেছে—চিলটা উড়ছে—মন-বিহঙ্গ উড়ে চল—

"তাজা খবর, রুশ-জার্মানের ভারী লড়াই—মহাত্মাজীর গেরেপ্তার"—

এবার বাড়ির গলি। দিলীপ হাত দিয়া ললাট মুছিল। তা—জা খবর। রুশ-জার্মানী যুদ্ধ। সভ্যতা ভেঙে পড়ছে! (তপন) বড় বড় অট্টালিকা রেণু রেণু হয়ে আকাশের শূন্যতায় আশ্রয় খুঁজছে। তা—জা খবর। গুলি ছুটছে— মানুষ মরছে, টর্পেডো—মানুষ মরছে, ট্যাঙ্ক—মানুষ মরছে, হ্যাঁ, মানুষ মরছে। গলিত শবের স্তূপ মাটির উর্বরা শক্তিকে বিষাক্ত করছে। শুনছ, কেউ বাঁচবে না। (আমার মাথাটা গোল হয়ে যাচ্ছে) কিন্তু কেন কেউ বাঁচবে না? (আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে) বাঁচ, বাঁচ, বাঁচ, অনন্ত বায়ুসমুদ্র থেকে যথেচ্ছা

বায়ু আহরণ করে তোমাদের বক্ষের সমস্ত কন্দরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোমরা বাঁচ। মৃত্যু। আর একঘণ্টা পরে শ্মশানের দিকে সবাই রওনা হব। তপন মারা গেছে। কে লিখবে এই যুগের বিয়োগান্ত কাহিনী ? দিলীপ—লেখ তুমি কবিতা। মানুষেরা মরেছে—কিন্তু পৃথিবীর সৌন্দর্য একতিলও কমে নি। এই অনির্বাণ নরকাগ্নির পাশেই সুন্দরী পৃথিবীর নগ্ন-যৌবন সুরলোকের সৌন্দর্যকে তুচ্ছ করে দিচ্ছে। তবু কেউ তা দেখে না,তার ইঙ্গিত বোঝে না। এইখানেই তো ট্রাজেডি। মানুষ ভাই, আমার কথা শোন। আমি সকলকে বলছি। শুধু চল্লিশ কোটি ক্রীতদাসকে নয়। এই বিপুলা পৃথিবীর সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। বাঁচ ভাই—বাঁচ। পৃথিবী বড় সুন্দর। এখনও আমাদের মনে আশা আছে, আছে স্বপ্ন ? এখনও আমরা ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসি, ভালোবাসতে পারি। তাকাও এই চির-যৌবনা মায়ের দিকে। বিস্তৃত ক্ষেতের বুকে পাকা ধানের উপর বাতাস শিস দিয়ে যাচ্ছে। রূপালী জলের উপর নৌকাগুলো নাচছে (সেদিনকার কথা মনে পড়ে)। অনন্ত নীলিমার উপর হঠাৎ দুরন্ত শিশুর মতো মেঘেরা এসে খেলা করে যাচ্ছে। নিশীথিনীর অজস্র কালো কেশের অন্তরালে নিদ্রা এসে স্বপ্নের সঙ্গে ফিসফাস করে কথা বলে (আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে)। ভালোবাস সকল মানুষকে। তাদের আত্মার রহস্য উদ্ঘাটন করে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন কর। অনন্ত জ্যোতিষ্কের পথ বেয়ে অভিসারে চল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানতে—মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াও ঈশ্বরের সামনে—আঃ—আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—এই যে বাড়ির দরজাটা—ভাঙা দরজা—

"মা—"

দরজা খুলিল। দ্বারপার্শ্বে কল্যাণীর মুখ। বিশীর্ণা তাপসী।

"এত দেরি হল কেন রে ?

"তপন মারা গেছে—তাই।"

"কিসে ? যক্ষ্মায় ?"

"হ্যাঁ।"

"ভালোই হয়েছে, সে বেঁচেছে।" কল্যাণীর কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপিল না,

সে একটুও দুঃখ বোধ করিল না। কেনই বা দুঃখিত হইবে সে? সে জীবন হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহার চল্লিশ বছরের পৃথিবীবাসে যে তিক্ত, জ্বালাময় যন্ত্রণার আস্বাদ সে পাইয়াছে তাহা তাহাকে অনেকটা স্বার্থপর, উত্তাপহীন করিয়া তুলিয়াছে; তপন কিংবা দিলীপের মতো দার্শনিক করিয়া তোলে নাই।

দিলীপ ভিতরে গেল।

"হ্যাঁরে, শেখরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?" কল্যাণী প্রশ্ন করিল।

"হুঁ—আধ ঘণ্টা আগে।"

"তারপর? বাবু কি বল্লেন? বাড়িতে আসতে বুঝি মোটেই ভালো লাগে না?" (আমার সব ছেলেগুলো পাগল—বাইরে বাইরে ছোটে—তাই যেন থাকে)।

"আসবে আজ রাত্তিরে।"

"আহা—কৃতার্থ হলাম।"

"আর দুটো টাকা তোমায় দিয়েছে—খরচের জন্য।"

কল্যাণী টাকা দুইটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে একটু হাসিল, "যাক—একেবারে তাহলে ভোলে নি। উঃ বাবা—তোরা যে কোত্থেকে এসেছিস—খালি মানুষ, মজুর, সমাজ, দেশ, বড় বড় কথা বলা (তাই করিস তোরা চিরকাল—প্রমথ কোথায়? কোথায় আমার খোকা?)—কি হবে এসবে?"

"চুপ কর মা—একমুঠো খেতে দাও।" (মা তো নারী, মাও তপনের মৃত্যুর খবর পেয়ে একটু দুঃখিত হল না!)

"চান করবি না?"

"না।"

"কেন?"

"শ্মশানে যেতে হবে।"

কল্যাণী উত্তর দিল না, রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, খেয়ে যা তবে।"

হাতমুখ ধুইতে ধুইতে দিলীপ হঠাৎ অনুভব করিল যে বাড়িটা বড় নিঃশব্দ।

"মা—"

"কি?

"বাবা নেই?"

"না।" (কোথায় গেল লোকটা? একেবারে পাগল।)

"কোথায় গেছে?"

"কি জানি—আমার ওপর রাগ করে বিবাগী হয়ে রাস্তায় বেড়াচ্ছেন। উঃ—কি·মেজাজ বাপু তোমাদের!" (সত্যি কোথায় গেল? বেলা বারটার কম হয় নি। সেই ছোট বেলার মতো এখনও রাগী, জেদী। আজ একটু হাত ধরে দুটি মিষ্টি কথা বলতে হবে। ছাই। মিষ্টি কথা আর সংসারের চাপে মুখ দিয়ে বেরোয় না। না, মিষ্টি কথা বললে ভারি খুশী হন। মনে পড়ছে··· ফুলশয্যার রাতের কথা···কি যে মাথামুণ্ডু ভাবছি—ছেলেটা দাঁড়িয়ে ওখানে)।

"উমা কেমন আছে মা?" হঠাৎ দিলীপের মনে পড়িল। আশ্চর্য, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

"মনে পড়েছে! মেয়েটার ভাগ্যি ভালো। কেমন আবার থাকবে, একই রকম, জ্বর ক্রমেই বাড়ছে (আহা, বেচারী)—"

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া দিলীপ উমার ঘরে গেল।

উমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দভাবে শুইয়া আছে, গোরা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে।

উমার ললাট স্পর্শ করিয়া দিলীপ বুঝিল যে, জ্বর অনেক বেশী।

দিলীপের ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে উমা চোখ মেলিল। জ্বরের উত্তাপাধিক্যে তাহার চোখ রক্তাভ ও অশ্রুপূর্ণ। দাদাকে দেখিয়া সে হাসিল। আঃ, ছোড়দা যেন স্বর্গের দেবতা। সাগ্রহে সে দিলীপের হাতটি একহাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

"ভারি কষ্ট হচ্ছে, না রে খুকী?" আদর করিয়া দিলীপ বলিল। খুকী বলিয়া ডাকিলে উমা ভারি খুশী হয়।

আরক্ত চক্ষু মেলিয়া উমা আবার হাসিল। সে হাসি বড় বিচিত্র। ক্লান্তি, আনন্দ ও নির্লিপ্ততার একটি সংমিশ্রণ।

গোরা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। দাদা এসেছে, পালাব? আমি 'দাদা' বলে ডাকতে পারি না। রামুর মতো আমার একটা পুতুল চাই দাদা। যা চাই তা বলতে পারি না। অনেক দূরে, অ—নে—ক দূরে একটা ভারি অদ্ভুত দেশ আছে—কেন একথা মনে পড়ে। আমি কেন কথা কইতে পারি না?

"গোরা ভায়ের খবর কি?" দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল।

গোরা হাসিল। আমিও আর সবায়ের মতো দেখতে তবু কেন কথা বলতে পারি না! রাজপুত্র চলেছে ঘোড়ায় চড়ে সেই অনেক দূরের দেশে, তার ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে ধূলোর ঝড় উড়ছে তেপান্তরের মাঠে—দাদা কি ভাবছে?

দিলীপ উমার হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল। উমার জ্বর বেড়েছে, কি করব? বিকালে এসে ডাক্তার দেখাব। তপন ডাকছে। আগুন জ্বলবে—যাই—

উমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

"আমি যাই রে খুকী, কাজ আছে। ভয় কি, আজকেই তোর জ্বর কমে যাবে।"

উমা আবার ম্লান হাসিল। সেই পুরাতন হাসি। একটিও কথা বলিয়া নিজের গাম্ভীর্যের আবরণকে সে ছিন্ন করিল না।

"আমি যাচ্ছি মা—"

"আয়—" কল্যাণীর কণ্ঠস্বর কলতলা হইতে ভাসিয়া আসিল।

দিলীপ রাস্তায় নামিল। তপনের ওখানে পৌঁছুতে মিনিট পনের লাগবে। তারপর উমার জ্বর বড় বেশি হয়েছে। তুই মরিস না বোন। মৃত্যু। উঃ, আজ অসহ্য গরম। হে অংশুমান, তুমি বড় নিষ্করুণ। অসীম আকাশে এই শ্রাবণ মাসেও মেঘ নাই। বিরাট আকাশ। তাতে কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ। গ্রহে গ্রহে ষড়যন্ত্র চলছে—আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহের মানুষদের ভাগ্য নিয়ে। সাবধান—সতর্ক হও। অদৃশ্য শক্তির চক্রান্তকে অস্ত্র দিয়ে ব্যর্থ করা যায় না।

অস্ত্র ফেলে দাও। সত্য, প্রেম, অহিংসার অদৃশ্য অস্ত্রগুলিকে শানিত করো। বাঁচ—বাঁচ। বিষবাষ্পে নিশ্বাস রুদ্ধ করো না। ট্রেঞ্চের আড়ালে মৃতমাংস-স্তূপের উপর বসে শান্তির স্বপ্ন দেখা যায় না। প্রজাপতিরা কোথায় গেল? কোথায় গেল আত্মার সঙ্গীত? ভালোবাসা—ভালোবাসা? বীণা। একটি উত্তপ্ত দেহের মোহময় আবেষ্টনীতে সব কর্মের অবসান করব? (আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে) কি কুৎসিত ঐ বুড়ো ভিখারীটা। গৌতম, তুমি কাপুরুষ না বীর?

"মশাই, কেশোলাল ধনীলালের দোকানটা কোথায়?" হারানাথ প্রশ্ন করিল।

দিলীপের কানে তাহার প্রশ্ন গেল না। সে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। দ্রুতপদে ভাবিতে ভাবিতে সে দূরে মিলাইয়া গেল।

হারানাথ একটু দাঁড়াইয়া রহিল। ছোকরা কি অভদ্র, কথার জবাবটাও দিলে না। অদৃষ্ট। কিন্তু আজ আমায় একটা চাকরি যোগাড় করতেই হবে। সুরমা আর সুরমার মা কেউ কাল রাত থেকে এ বেলা পর্যন্ত খায় নি। আমিও খাই নি। ধার চাইবার মুখ নেই। কে দেবে? কেন দেবে? আমি ফেরত দেব কেমন করে? গোবিন্দ মোক্তার আর টাকা দেবে না। সে আমার কাছে চল্লিশ টাকা পায়। আরও টাকা সে দিতে চায়, তার বদলে সে চায়—নাঃ, আর ভাবব না।—

একজন লোক পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে সে প্রশ্ন করিল, "মশাই, কেশোলাল ধনীলালের দোকান কোনটা?"

"আর দশ পা এগিয়েই ডান দিকে।"

হারানাথ অগ্রসর হইল। কিন্তু যদি কোথাও কিছু না পাই? উঃ, ভারি ক্ষিদে পেয়েছে—

কিছুদূর গিয়াই দোকানটি সে দেখিতে পাইল।

সে ভিতরে ঢুকিল।

তাকিয়ায় ঠেস দেওয়া সিদ্ধিদাতার মতো বিপুলকায় শেঠজীকে প্রণাম জানাইয়া হারানাথ বলিল, "হুজুর, কোনোও কাজ খালি আছে?"

শেঠজী চোখ তুলিয়া দেখিল একটি বছর চল্লিশের লোক, ম্যুব্জদেহ, রোগা ময়লা কোট পরিহিত, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন।

"নেহি—কোই কাম নেহি আছে।"

"হুজুর—বড় বিপদে পড়েছি—"

শেঠজী গর্জন করিয়া উঠিল—"বোলা তো, নেহি হ্যায় কোই কাম—যাও ভাগো—"

একজন কর্মচারী চক্ষু পাকাইয়া আগাইয়া আসিল।

আবার রাস্তা। কিছু একটা কাজ যোগাড় করতেই হবে—উঃ ক্ষিদে পেয়েছে—

একটু ছায়ায় গিয়া হারানাথ দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ মংরু অভ্যাসবশে হাত পাতিয়া বলিল, "কুছ দো বাবুজী, দয়া করো—"

হারানাথ চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরে একটু হাসিল। বিশীর্ণ প্রেতের হাসি।

তারপরে সে চলিয়া গেল।

মংরুর বাইশ বছরের মেয়ে রামধনিয়া বলিল, "তুই যার-তার কাছেই পয়সা চাস।"

মংরু একটু হাসিল, "দেখা নেই থা বেটি—"

রামধনিয়া বলিল, "আমি যাই—ঐ হোটেল থেকে কিছু খানা আনতে পারি কিনা দেখিগে—"

"আচ্ছা বেটি।"

রামধনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নিজের পায়ের দূষিত ক্ষতটাকে ভালো করিয়া বাঁধিয়া সে মুসলমান হোটেলটির পিছন দিকে গিয়া দাঁড়াইল।

গণি মিঞা রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল।

রামধনিয়া কান্নার স্বরে বলিল, "এ বাবু—কুছ খানেকো দো—কালসে কুছ নেই খায়া—"

গণি মিঞা ছোট ছোট চোখ মেলিয়া বিড়ির ধোঁয়ার আড়াল হইতে তাহার দিকে চাহিল।

রামধনিয়া বুকের উপরকার কাপড়টা একটু সরাইয়া দিল। একটি স্তন।

গণি মিঞা উঠিয়া দাঁড়াইল, "ইধার আ।"

রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিতে হয়।

রফিক গণি মিঞার সাগরেদ, বাহিরে লোকদের পরিবেশন করিতেছিল। সে খাবার লইতে ভিতরে আসিল।

"গণি ভাই—এ গণি ভাই—"

খাবার লইয়া রফিক বাহিরে গিয়া আবদুলের পাতে দিল।

খাওয়া শেষ হইলে আবদুল রংদার রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল, তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া রাস্তার লোক চলাচল দেখিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ।

হঠাৎ সে রাস্তায় একটি সুবেশ লোককে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

খাবারের দাম দিয়া দ্রুতপদে সে সুবেশ লোকটির পশ্চাদনুসরণ করিল।

চৌরাস্তার মোড়ে ভিড়।

আবদুল হঠাৎ সবেগে লোকটির পার্শ্বে গিয়া ধাক্কা দিয়া পড়িতে পড়িতে লোকটিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মাফ করবেন হুজুর—বড় ভিড়—"

লোকটি কিছু না বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

আবদুল দ্রুতপদে পার্শ্বস্থ গলিতে অগ্রসর হইল। একটি ব্যাগে পনরটি টাকা আর এক যুবতীর ছবি। হাত সাফাই।

আবদুল ব্যাগটি ফেলিয়া দিয়া টাকাগুলি পকেটে রাখিল এবং ছবিটিতে একটি চুম্বন করিয়া তাহা দেখিতে দেখিতে গলি দিয়া চলিল।

গলির মধ্যে একটি বাড়ির বহির্দেশে একটি ডাস্টবিনে অনেক আবর্জনার স্তূপ।

একটি অতি বৃদ্ধ ভিক্ষুক ডাস্টবিনটি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কিছু উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিল। ক্ষুন্নিবৃত্তির উত্তেজনায় তাহার দুইটি স্তিমিত নেত্রে জল আসে।

একটি বলিষ্ঠ কুকুর আসিয়া সেই উচ্ছিষ্টের দিকে মুখ বাড়াইল।

ভিক্ষুক হাতের সামনেকার একটি থান ইট তুলিয়া সক্রোধে কুকুরটিকে মারিল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে করিতে কুকুরটি গলি দিয়া ছুটিতে লাগিল। যন্ত্রণায় তাহার পাকানো লেজ গুটাইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ চলিয়া অবশেষে সে থামিল। একটি ল্যাম্পপোস্টের পার্শ্বে পশ্চাতের পদদ্বয়ের উপর বসিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। দু-একবার ঘাড় বাঁকাইয়া তির্যক দৃষ্টিতে সারা গলিকে দেখিয়া ধীরে ধীরে সে গোঙাইতে লাগিল।

একটি কাক পথের উপর কি একটা দেখিয়া সামনের বাড়ির দেওয়াল হইতে নামিয়া আসিল।

কুকুরটি আড়নয়নে তাহাকে দেখিল।

কাকটি আরও নিকটে আসিল।

হঠাৎ কুকুরটি গর্জন করিয়া উঠিল।

কাকটি লাফাইয়া উঠিয়া ডানা মেলিল, কয়েকবার ডানার ঝাপটে অবরুদ্ধ বায়ুবেগকে আবর্তিত করিয়া উপরে উড়িল।

কিছুদূর উড়িয়া সে একটি বড় জানালার আলিসায় বসিল।

জানালা দিয়া সে একবার ঘরের ভিতর চাহিল।

ঘরের ভিতর একটি ছাত্র ও একটি সপ্তদশী যুবতী।

"আজ নাকি গান্ধীজীকে arrest করেছে হিরুদা।"

"হ্যাঁ—"

"কেন?"

"চুলোয় যাক ও-সব কথা। লীলা, মা ঘুমোচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ—"

শয্যার উপর একটা গুরুভার দেহ পতনের শব্দ। কাক চমকিয়া উঠিল।

"তোমায় ভালোবাসি লীলা, আকাশের নক্ষত্র দিয়ে তোমার জন্য আমি মালা গাঁথব—"

কাক উড়িল।

অনেকদূর আসিয়া আবার একজায়গায় সে বসিল।

সে বাড়ির ভিতরে মেয়েরা সকলে ঘুমাইতেছে।

কাক আবার উড়িল।

একটি ত্রিতল অট্টালিকার বারান্দায় গিয়া আবার সে বসিল। যদি কিছু খাদ্য পাওয়া যায় এই আশায়।

"ভাগ রে শালে—" একটি চাকর হাত তুলিয়া তাহার দিকে আসিল।

কাক পলাইল। বায়ুস্তব বড গবম। তাহার ডানা উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহার কঠিন বক্র চঞ্চুর মধ্যে একটি ক্রুর কালো কামনা।

একটি চড়াই উড়িয়া যাইতেছে।

কাক তাহাকে তাড়া করিল।

চড়াই আর্তনাদ করিয়া গঙ্গা পাব হইল।

হাওড়ার পুলে বড় ভিড়।

কাকও চড়াইয়ের পিছন ছাড়িল না।

যেখানে বড় বড় কলের বড় বড় চোঙগুলো আকাশেব দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারই পশ্চাতের একটি বস্তির মধ্যে একটি বাড়িতে গিয়া চড়াইটি থামিল। বাড়িটি বাঁধানো, ছোট, ভাঙা।

কাক সেই বাড়ির চালায় বসিল।

সে ডাকিল—"কা—কা—"

একটি বছর পনেরর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী তরুণী সেই ডাক শুনিয়া কাককে বারান্দা হইতে ভেংচাইল, "কা—কা কি রে পোড়ারমুখ ?"

কে যেন তাহার কথা শুনিয়া রাস্তা হইতে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরুণী তাহার দিকে তাকাইল, তাহার মুখমণ্ডল মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে সহাস্যে বলিল—"বাবুজি—তুমি !"

শেখর বলিল, "হ্যাঁ কলাবতী।"

তরুণীর নাম কলাবতী। তাহার বয়স পনের নয়, ষোল। সে প্রতাপ সিংয়ের মেয়ে। প্রতাপ সিং জাতিতে রাজপুত, নিবাস চিতোর। সে বসাকদের মিলেতেই কাজ করে।

শেখর প্রশ্ন করিল, "সিংজী কোথায় কলাবতী ?"

"বাড়ি নেই।" কলাবতী বলিল। সে বাঙলা দেশে রাজপুতানা হইতে আসিয়াছে প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ। তাই সে বেশ বাংলা বলিতে পারে।

"বাড়ি নেই! তবে!" (এবার তবে কি করব? কিন্তু আজ আমার এখানকার সব মিটিয়ে যেতেই হবে।)

কলাবতী হাসিল, "তাতে ভাববার কি আছে বাবুজী? এস বোস।"

"কোথায় গেছে সিংজী ?"

"বাজারে।"

"কত দেরি হবে ফিরতে ?

"ঘণ্টাখানেক!"

"তাইতো"—(অপেক্ষা করতেই হবে, কি করব—কিন্তু ভারি ক্ষিদে পেয়েছে, কি করি?)

"কি মুশকিল, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ফলটা কি, ভিতরে এস।"

"হুঁ—"

শেখর বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাশের বাড়িতে কোনও একটি ছেলে বোধ হয় ভেঁপু বাজাইতেছে। কাকটি ডাকিল—"কা—কা"

কলাবতী আড়নয়নে কাকের দিকে চাহিল।

শেখর হাসিল, "আর একবার ওকে ভেংচাও, কলাবতী—"(কি করি এখন?)

কলাবতী হাসিল। সে ভারি সুন্দর হাসে, বাসন্তী রংয়ের শাড়ির আঁচলটা কোমরে বাঁধিয়া লইয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"না।"

"কেন?" শেখর একটু আশ্চর্যবোধ করে। মেয়েটা আবার রাগে কেন?

"কেন? বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুমি করছ কি?"

"কি আবার করব?"

শেখরের একটি হাত ধরিয়া সজোরে একটি টান দিয়া কলাবতী বলিল, "ভিতরে এসে চৌকীর উপর বসে জিরোবে, বুঝলে ?"

শেখরের উত্তরের কোনও অপেক্ষা না করিয়া সে তাহাকে ঘরের ভিতরে টানিয়া লইয়া বসাইল। এককোণে বাক্সের উপর রক্ষিত একটি পাখা লইয়া আসিয়া পরে তাহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

একি ব্যাপার ? শেখর হাসিল। মেয়েটা একেবারে পাগল। কি সুন্দর ওর চোখের তারা দুটো। যেন খঞ্জন পাখির চোখ।

কলাবতী মাথা নাড়িল, চোখ পাকাইল, ঠোঁটের উপর বাঁ হাতের তর্জনীটি রাখিয়া বলিল "চুপ্।"

"কেন ?" (সিংজী কখন আসবে ?)

"রৌদ্দুরে হেঁটে এলে একটু চুপ করে বসে হাওয়া খেতে হয়।"

"বটে !"

"জী হাঁ—"

"বেশ তবে চোখ বুজে শুয়েই পড়ছি বুঝেছো ?"

"আচ্ছা।"

শেখর সত্যই ক্লান্ত হইয়াছিল, তদুপরি ক্ষুধা। সে চোখ বুজিয়া চৌকীর উপর শুইয়া পড়িল।

কলাবতী সমানে বাতাস করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু শেখর চোখ বুজিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না।

একটু পরে যখন সে চোখ খুলিল তখন আর কলাবতী ঘরে নাই।

পাশের ঘরে তখন কলাবতী মাকে ডাকিতেছে, "মা—ও মা, শোন—শেখরবাবু এসেছে।"

পরক্ষণেই কলাবতী তাহার মায়ের সহিত ঘরে ঢুকিল।

"এই যে বেটা, এসেছ ?"

"হাঁ মাসী !"

"তোমায় ভারি শুকনো দেখাচ্ছে যে—চান কর নি ?"

"না।"

"ওঃ, তাহলে খাওয়াও হয় নি তো?"

"মাসী তো আছই।"

কলাবতীর মা হাসিল, "ঠিক বলেছে বেটা, কলাবতী—ভাইয়ের জন্ত চানের জল দে, আমি রান্নাঘরে যাই।"

কলাবতীর মা চলিয়া গেল।

"ওঠ বাবুজী—"

"বাবুজী কেন?—ভাইয়া—"

"ইস্"—কলাবতী হাসিল, "আমার ভাইয়া না ছাই।"

"তবে কি?"

"জানি না।"

"কিন্তু আমার জানা যে উচিত ভাই—"

শেখর কলাবতীকে অনুসরণ করিতে করিতে ভাবে। কলাবতী ভারি আশ্চর্য মেয়ে। ও বাঙালী মেয়ে নয়। শুকনো মাটির ফুল ও। পাথরের মতো কঠিন, খড়্গের মতো ধারালো ওর মন, পার্বত্য ঝরণার মতো দুর্নিবার প্রাণস্রোতে ওর নবীন যৌবন উজ্জ্বল বেগবতী। ও কমরেড পদবীযোগ্যা। পুরুষ আর নারীতে ভবিষ্যতে বেশী পার্থক্য থাকবে না। আমাদের সেই পৃথিবীতে ওরাও পাথর কাটবে, ফসল ফলাবে, লড়াই করবে। কিন্তু আমায় 'ভাইয়া' বলতে চায় না কেন কলাবতী?

কলাবতীর মনের ভিতর এতক্ষণ ধরিয়া অদৃশ্য সাঙ্কেতিক অক্ষরে যাহা লিখিত হইতেছে, অর্ধেক বোধগম্য, অর্ধেক অপরিস্ফুট যে ছবিগুলি সেখানে ছায়াছবির মায়া রচনা করিতেছিল সেগুলি এই :—মধ্যাহ্ন দ্বিপ্রহর, শুষ্ক মাটি, মরুভূমি, মনে পড়ে অনেক কথা। সেই চিতোর দুর্গ, উঁচুনিচু পথ, ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্ত আর নূপুরের শব্দ, অশ্বারোহী পথিকের দুর্গদ্বারে বিশ্রাম। রাজপুতানার গল্প। আমি রাজপুতানী। চিতোর, জয়পুর, যোধপুর, আজমীর। রাজপুত বীরেরা, পর্বতশৃঙ্গে বাঁকা তলোয়ারের আস্ফালন। তাদের প্রেয়সীরা। ভালোবাসা। রাজপুতানীর ভালোবাসা—আমি

রাজপুতানী। আমার নূতন যৌবন, আমার বয়স ষোল, আমার এই সুন্দর দেহ (কতদিন নিভৃতে আমি তা দেখেছি)। আমার মনের আশ্চর্য পরিবর্তন, আমার দৃষ্টির আকস্মিক রূপান্তর। আমি বীরকে ভালোবাসি। তলোয়ার হাতে না থাকলেই বা কি—বাবুজীও বীর। সেই দুর্গের ফটকের সামনে যদি একটা কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুতের পোশাক পরে ঝকঝকে তলোয়ার হাতে নিয়ে ও দাঁড়ায়—আমি বলব না ওকে ও আমার কে—না।

খাওয়া শেষ করিয়া শেখর আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

কলাবতীর মা বলিল, "বেশী কিছু ছিল না বেটা, তোমার হয়তো গরীবি খানায় কষ্ট হল।"

শেখর হাসিল, "আমিও মজদুর, আর তোমার বোনও তো বড়লোক নয় মাসী।"

"তোমাদের সঙ্গে কথায় পারার জো নেই। আচ্ছা বেটা, তুমি আরাম কর, আমিও একটু শুইগে, কেমন ?"

"আচ্ছা মাসীমা।"

এইবার কলাবতীর প্রবেশ।

"নাও—"

"কি ?"

"পান।"

নিজেও কলাবতী এক খিলি পান খাইয়া আসিয়াছে।

"বেঁচে থাক ভাই, ওঃ—নিজে আগে খেয়ে তবে এনেছ ?"

"হ্যাঁ, নিজের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়ায় আর কী আছে ?"

"কিছুই নেই ?" (তা মিথ্যা কথা। সমগ্র মানব জাতি, আদর্শ আছে। নিছক আমিত্বের, সংকীর্ণ আমিত্বের মানে পশুত্ব।)

"হয়তো আছে।" কলাবতী হাসিল।

"কী ?"

"জানি না।"

কিন্তু কলাবতী তাহা জানে।

"উঃ, ঠোঁট যে একেবারে টুক্‌টুকে লাল করে তুলেছ কলাবতী।"

"হ্যাঁ—"

"বেশ দেখাচ্ছে।" (সিংজী বড় দেরি করছে।)

"তা জানি।" কলাবতী নিজের খোঁপা খুলিয়া দিল। অজস্র কেশের রাশি মসীকৃষ্ণ মেঘের মতো সারা পিঠে ছড়াইয়া পড়িল।

"কি করে জানলে?"

"আয়নায় দেখে এসেছি।"

শেখর হাসিয়া উঠিল। আঃ, কী সুন্দর এই মেয়েটির জীবন!

"তুমি বড় জোরে হাস বাবুজী—"

"বটে। আচ্ছা চুপ করছি।"

"ঘুমোও না একটু—"

"ঘুমোবার সময় কই—অনেক কাজ আছে। (অনেক কাজ। মানুষের চরম আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ঘুমোবার সময় থাকে না—অনেক কাজ। তবু, শরীরটা ক্লান্ত, একটু গড়িয়ে নিই। কাল রাতে ঘুম হয় নি। বাড়ি যাই নি। মা আমার দুঃখিনী ভারতবর্ষের মতো—আহা! মা, তোমার কত দুঃখ—)

শেখর শুইল, চোখ বুজিল।

"সে কি! শুলে যে, তোমার যে অনেক কাজ।"

"হুঁ"—(সিংজীর এবার আসা উচিত। এখানকার কাজ শেষ করে সন্ধ্যেবেলায় মিটিং। গান্ধী, নেহরু, মুভ্‌মেণ্ট। স্বাধীনতা চাই। কিন্তু দলাদলি? আমাদের এবার কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই দুর্দিনে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আপোসের চেয়ে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠা হবে কি? আমাদের জয় তো হবেই। কিন্তু যা সকলেরই চাই—সেই স্বাধীনতার জন্য আমাদের আগে এক হতে হবে। বড় মুশকিল। বিরাট দেশের এই দুর্ভাগ্য। স্বার্থপর নেতাদের আত্মকলহ। একি! পা টিপছে কে?)

"ওকি, তুমি আমার পা টিপছ কেন?" শেখর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

"এমন সুন্দর পা দুটো—তাই একটু লোভ হল।"

"না না—ছিঃ—"

"ছিঃ কেন? তোমার বয়স কত?"

"আটাশ—"

"ওঃ—তবে তো তুমি একজন বুড়ো, আর আমি তো, একটা ছোট্ট লড়্‌কী।"

না হাসিয়া পারা যায়? শেখর হাসিল।

আবার চিন্তা। এবার শঙ্করকে বলতে হবে, এবার আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। সকলকে এবার একসঙ্গে মিলতেই হবে। না, এর কোনও অর্থ হয় না। দিনের পর দিন, এই পরাধীনতা, এই আত্মকলহ, সংস্কার ও অন্ধকার কারাগৃহে বন্দী হয়ে কথার বুদ্বুদের মাঝে আত্মশক্তির ক্ষয় করা,—এ নির্বোধের দর্শন।

কলাবতীর চিন্তার সারাংশ :—মনে পড়ে—প্রখর সূর্যালোকিত প্রান্তরের ছায়ায় মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা, দূরে চিতোর-দুর্গের ভগ্ন প্রাকার, বালুমিশ্রিত উত্তপ্ত মৃত্তিকার লোলজিহ্বা। কালো ঘোড়ার দেহে ঘামের স্রোত, আর আরোহীর ক্লান্ত দেহ। আঃ, কি সুন্দর ওর পা দুটো—এই দুটো পায়ে জরির কাজ করা লাল নাগরা ভালো মানাবে। জ্যোৎস্না রাত্রে, দূর পর্বতের পাদদেশে রাখাল-বালক বাপ্পাদিত্যের বাঁশি বাজে, সোলাঙ্কী রাজকুমারীর চোখে মুগ্ধ বিস্ময়, হৃদয়ে পূর্ণিমাস্ফীত নদীর ঢেউ। আমার শরীরে একি অনুভূতি? বলব না ওকে ও আমার কে, না।

"আরে শেখরবাবু যে! কখন এসেছে?" সিংজীর গলা। শেখরের চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। কলাবতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে সিংজী..."

"বেটী এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো"...সিংজী মেয়েকে বলিল।

কলাবতী জল আনিতে গেল।

"আমি অনেকক্ষণ এসেছি"…শেখর বলিল।

"খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ?" সিংজী জানে শেখর কোন প্রকৃতির কর্মী।

"নিশ্চয়ই, মাসী থাকতে কষ্ট হবে না।"

সিংজী হাসিল, "তারপর, কি ব্যাপার ?"

"বড় দরকার…"

"বুঝতে পেরেছি—ধর্মঘট নিয়ে তো ?"

"হ্যাঁ, আচ্ছা ব্যাপারটা কি সত্যি ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে একবার ওদের এখানে ডাকতে হয়।"

"কাদের ?"

"নবীন, আস্‌রফ্‌, লক্ষ্মণ এদের।"

আস্‌রফ্‌, উমেশ আর পরেশ—এরা বাবুদের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে,… ওরা তো আসবে না, বাকি, সকলকে ডাকাই ওবে।"

"বেশ, তাহলেই হবে।"

জল আসিল।

"বেটী…"

"জী…"

"একবার শিউনাথকে ডাক তো।"

শিউনাথ একটি ছোকরা, সেও মিলে কাজ করে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিউনাথ সকলকে ডাকিয়া আনিল।

সকলের মধ্যে আস্‌রফ্‌, উমেশ আর পরেশ অবশ্য ছিল না।

সিংজীর কথাই ঠিক।

সব মিলিয়া দশজনের সভা বসিল।

সিংজী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শেখরবাবু আজ কেন এখানে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ভাই সব…"

সমাগতদের মধ্যে লক্ষ্মণ সিং লোকটিই কথাবার্তা গুছাইয়া বলিতে পারে সে বলিল, "জী হাঁ…"

শেখর প্রশ্ন করিল, "ব্যাপারটা কি সত্যি ভাই ?"

লক্ষ্মণ চট করিয়া জবাব দিল না, একটু মাথা চুলকাইল, সকলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া পরে বলিল, "আজ্ঞে হঁ্যা, কিন্তু বুঝতেই পারছেন বাবুজী·· মজবুরী··· "

"কেন ?"

"অওরৎ বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, বেশীদিন এরকম ভাবে থাকলে···"

শেখর মাথা নাড়িল, "তোমার অবস্থা আমি বুঝি ভাই, কারণ তোমরা জান যে আমিও তোমাদের মতোই একজন মজুর। কিন্তু কথাটা ভুলো না যে, যে কাজ আরম্ভ করেছ তা যদি শেষ না হয় তার চেয়ে লজ্জার আর কিছুই থাকবে না। এ পরাজয় কেন তোমরা স্বীকার করবে ? যদি চারদিন ধরেই তোমরা ধর্মঘট চালালে, কাল থেকে তা কেন ভাঙবে ? এমন করলে তোমাদের দাবিপূরণ কখনও হবে না, তোমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না।"

হামিদ বলিল, "কিন্তু আমাদের এখন এ ছাড়া যে কোনও উপায় নেই···"

"কেন ?"

"বাবুরা নাকি অন্য মিল থেকে, বাইরের থেকে নতুন মিস্ত্রী আর মজুব আনাচ্ছে।"

শেখর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "তাতে ভয়ের কি ? আমি বলছি তোমাদের বাবুদের ও চেষ্টা সফল হবে না। অন্য লোক আসার পথ আমরা বন্ধ করব।"

হামিদ মাথা নাড়িল, "কিন্তু ব্যাপার অনেক দূর এগিয়েছে, অন্যান্য সব মিলের মালিকেরা এক জোট হয়ে আপনাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তৈরী হয়েছে।"

"তাইতেই বা কি ? তোমরা যদি ভয় না পাও, অন্যান্য মজুরেরা যদি ভয় না পায়, আমাদের তারা কী করতে পারে ?"

লক্ষ্মণ মাথা নাড়িল, "তা ঠিক, কিন্তু তাদের ঠিক রাখবে কে ?"

শেখর হাসিল, "আমি, তোমরা—আমাদের পার্টি। তোমরা তো জান আমাদের পার্টি দুর্বল নয়, আমাদের শক্তি বাড়ছে, আমাদের ভয় করে বলেই তো মালিকেরা দল পাকাচ্ছে। আমি বেশী কথা আর বলব না ভাই, বড বড় কথা বলতে আমি পারি না, কিন্তু এ কথাটা তোমরা কেন ভুলে যাও যে, তোমাদের দাবী, তোমাদের অধিকার ন্যায্য। শ্রম করবে তোমরা কিন্তু তোমাদের উপর সর্বময় প্রভুত্ব কোনো আর একজন করবে যে শ্রম করে না?"

সিংজী সায় দিল, "বেশঘ্, বেশঘ্..."

শেখর বলিয়া চলিল, "ভয় পেয়ো না ভাইসব, তোমাদের যদি আরও কয়েকদিন ধর্মঘট করলে সাংসারিক অসুবিধা হয় তবে পার্টি তা দূর করবে। আমায় তোমরা চেন, আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের ··"

সকলে পরস্পরের মুখের ভাব লক্ষ্য করে। সম্মতির ভাব।

শেখর বলিল, "এই হয় ভাইসব, ভালো কাজের অনেক শত্রু। এই তো... এখানে আসার আ'গ আমাকে একজন গুণ্ডা শাসাচ্ছিল যে, এখানে এলে আমায় মেরে ফেলবে।"

একটু হাসিয়া সে বলিল, "কিন্তু আমি তো এসেছি।"

গঙ্গাপ্রসাদ নামে একজন দল হইতে অলক্ষ্যে উঠিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

চালের উপর কাকটি তখনও বসিয়া। সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া ধারালো ঠোঁট একটু নিজের পায়ে ঘষিয়া ডাকিল, "কা···কা···"

কালো কাকের কর্কশকণ্ঠে কালো কামনার গান।

অন্দরমহলে কলাবতী বসিয়া সব কথা কান পাতিয়া শোনে, দরজার ফাঁক দিয়ে সে সকলকে দেখে।

কলাবতীর মনের কথা: বাবুজীকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে! তার দীপ্ত মুখে অপূর্ব ভঙ্গী, তার কণ্ঠে আবেগ, মক্তিকামীর স্বপ্ন তার চোখে।

নির্জন মরুভূমিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। (বেলা কম হয় নি। চারটে বাজে।) গ্রামের শেষে, মরুভূমির প্রান্তে, বালিয়াড়ীর উপর মুখোমুখী বসে

দুজনে অনেক গল্প করা যাবে। ক্রমে রাত হবে। উপরে চাঁদ থাকবে। চাঁদ না নক্ষত্রের দল? মাঝে মাঝে কথা বন্ধ কর। চারিদিকে দিনান্তের প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মাঝে মাঝে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে পরস্পরের দৃষ্টির মধ্যে ডুব দাও। ভাব। গোহ। শিলাদিত্য। বাপ্পাদিত্য। বাঁশিতে অজানা সুর। সোলংকী রাজকুমারী, অভিসারে চল।

শেখর সকলের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া লইল। না, ভয় নাই।

হঠাৎ হাতজোড় কবিয়া সে সকলকে বলিল, "ভাইসব, আমরা মানুষ, আমরা পুরুষ, আমার মিনতি—তোমরা হারা মেনো না…"

লক্ষ্মণ লজ্জিতকণ্ঠে বলিল, "আমাদের লজ্জা দেবেন না বাবুজী, আমরা আপনার কথা মানব।"

গঙ্গাপ্রসাদ ঘর ছাড়িয়া পথে নামিল।

কিছুদূর গিয়া সে বাঁ দিকের গলিতে প্রবেশ করিল। নোংরা নর্দমার পাশে সে দাঁড়াইয়া একটি বিড়ি ধরাইল। বিড়ি টানিতে টানিতে কোমরের দাদ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া চুলকাইল, তারপরে আবার চলিতে লাগিল।

গলিটি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটি বাড়ি।

গঙ্গাপ্রসাদ ডাকিল, "এ পরেশ, পরেশ—"

"কে?"

"আমি গঙ্গা—"

পরেশ বাহির হইয়া আসিল।

"কি খবর?

"ওরা মেনে নিয়েছে শালার কথা।"

"বটে। আচ্ছা চল তবে আস্‌রফের ওখানে।"

বাড়ির পার্শ্বস্থিত একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া তাহারা আর একটি গলিতে গিয়া পড়িল।

আস্‌রফের বাড়িতে পৌঁছাইতে তাহাদের দুই মিনিট লাগিল।

আস্‌রফ বাহিরে সাম্‌সুর সহিত কথা বলিতেছিল।

"কি খবর রে?" রফআস্ উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রশ্ন করিল।

"শালা ঠিক বুঝিয়ে হাত করেছে, লোকদের।" পরেশ পানের পিচ ফেলিয়া বলিল।

দাদ চুলকাইতে চুলকাইতে গঙ্গাপ্রসাদ সব ঘটনা খুলিয়া বলিল।

আস্‌রফ শুনিয়া মাথা নাড়িল, "তবে আর কি, এবার আমাদের কাজ করতে হবে সাম্‌সু ভাই।"

"জরুর"—সাম্‌সু রঙিন রুমাল দিয়া মুখ মুছিল।

"বাবুদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলে?"—পরেশ প্রশ্ন করিল।

"হ্যাঁ—আমি আর উমেশ গিয়েছিলাম।"

"কি বললে তারা?"

"কি আবার, দুষমনকে সাবাড় করতে বললে।"

"টাকা?" গঙ্গাপ্রসাদ হাসিল।

আস্‌রফ্ মাথা নাড়িল, "হাঁরে শালে, দিয়েছে। সাম্‌সুর পঁচিশ, আর আমাদের বিশ টাকা করে, কাজ হলে আরও পাবি। লে চল, এবার যাওয়া যাক। গঙ্গা, তুই আবার সেখানে যা, আমরা মাঠের ধারের রাস্তায় থাকব। ওখান থেকে ও বেরুলে আমাদের খবর দিবি—"

গঙ্গাপ্রসাদ ঘাড় নাড়ল—"আচ্ছা, তব্ রুপেয়া লাও না ভাই।"

নোটটিকে পকেটে রাখিয়া সে আবার ফিরিয়া চলিল।

সিংজীর বাড়িতে তখন শেখর ও সিংজী ছাড়া আর কেহ নাই। সকলে শেখরের কথায় রাজী হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। সে দূরে আগাইয়া গিয়া যশোদা বুড়ির বাড়ির দাওয়ায় বসিল। বাড়িটা খালি, বুড়ি মেয়ের শ্বশুর-বাড়িতে। সুতরাং কেহ কিছু বলিবে না।

বসিয়া বসিয়া সে দাদ চুলকাইতে লাগিল। উঃ, কি গরম। বেলা এখন পাঁচটা হতে চলেছে, তবু কি গরম! শালা এখনও বেরুচ্ছে না। তা এক রকম ভালোই, একটু অন্ধকারেই ওসব ভালো। একটু তাড়ি খেয়ে এলে হত না? না, বেইমানি হবে। পকেটে নোটটা ঠিক আছে।

ঘণ্টা দেড়েক কাটিল। সূর্য অস্তগামী।

গলি দিয়া দু একজন লোক যায়, গঙ্গাপ্রসাদকে দেখিয়া কেহ হাসে, কেহ কথা বলে।

"এখানে কি করছ গঙ্গা ভাই ?"

"এই একটু বসে আছি, নেশাটা জবর হয়েছিল।"

"ওঃ .."

মাঝে মাঝে গঙ্গাপ্রসাদ সিংজীর বাড়ির দিকে তাকায়। না, শেখরের পাত্তা নাই।

গলির মধ্যে আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল, ক্রমে তাহা আবছা হইল।

হঠাৎ হাসির শব্দ ভাসিয়া আসে। লঘু হাসি।

গঙ্গাপ্রসাদ চাহিল। শেখর ও কলাবতী আসিতেছে।

সে মুখ ফিরাইয়া দাওয়াব উপর শুইয়া পড়িল।

শেখর হাসিল—"তবে কি বলব ?"

"শুধু নাম ধরে ডাকবে—ব্যস।"

"আচ্ছা।"

"আবার কবে আমাদের এখানে আসবে ?"

"জানি না।"

"বল না, কবে আসবে ?" কলাবতীর কণ্ঠে অভিমান।

"কি করে বলি ? যখন কাজ পড়বে এদিকে তখন আবার আসব।"

"কাজ ছাড়া বুঝি আসবে না ?"

"অকাজে এসে লাভ কি ?"

"আমাকে দেখতে আসা কি অকাজ ?" কলাবতী একটু দুষ্টামির হাসি হাসিল।

শেখর তাহার দিকে চাহিল। নব-প্রস্ফুটিত ফুল।

সেও হাসিল—"অত ভাবি নি কলাবতী—আসব বৈকি। কিন্তু এবার তুমি বাড়ি ফের—যাও—"

"না"—চলিতে চলিতে কলাবতী শেখরের বাম হাতটি হঠাৎ নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

"ওকি!"

"আমার যখন খুশি তখন যাব।" মাথার চুল দুলাইয়া উদ্ধতা বালিকার মতো কলাবতী বলিল।

হঠাৎ তাহার যশোদা'র বাড়ির দাওয়ার উপর নজর পড়িল। গঙ্গাপ্রসাদ না? হ্যাঁ। কিন্তু সে শুইয়া আছে। মিটিং-এ ও এসেছিল না?

তাহারা আগাইয়া গেল।

গঙ্গাপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু হাসি তাহার চোখের কোণে ঝিলিক মারিল। ছৌড়ী বড় খপসুরৎ হয়েছে আজকাল, আচ্ছা।

সে তাহাদের অনুসরণ করিল।

গলির মোড়ে শেখর দাঁড়াইল, "এবার তুমি ফের লক্ষ্মীটি, যাও—"

"কাল এস বাবুজী—"

"আচ্ছা—"

"নিশ্চয়ই আসবে?"

"হ্যাঁ—"

শেখর আগাইয়া গেল। কলাবতী দাঁড়াইয়া রহিল।

কলাবতীর মনের কথা। বাবুজী আমায় অন্যভাবে দেখে। কিন্তু আমি? আমি তো আর ছোট মেয়ে নই। আমি এখন নারী। রাজপুতানী বীর ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না। সব বীরের হাতে তলোয়ার থাকে না। কিন্তু সব বীরের উদার হৃদয় থাকে। আমার বাপ্পাদিত্য। ঐ যায়। কি ভাবছ বাপ্পা? সাঁজ ঘনিয়ে এল। অন্ধকারে মনের দ্বার খুলে যায়। আমার জীবনে রূপান্তর ঘটেছে। আমার নূতন যৌবনের সহস্র কামনার রামধনু অন্ধকারে কি যে বলে—বুঝি না—আমি বললাম না ওকে ও আমার কে।

কলাবতী ফিরিল।

চলিতে চলিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পাশ দিয়া গঙ্গাপ্রসাদ চলিয়া গেল। এই না গঙ্গাপ্রসাদ শুয়ে ছিল, আবার সে যায় কোথায়?

সে তাহার পিছনে চাহিল।

গঙ্গাপ্রসাদ শেখরের পিছু লইয়াছে।

কলাবতীর মনে আশঙ্কা জাগে। সেও গঙ্গাপ্রসাদকে অনুসরণ করিল।

গঙ্গাপ্রসাদ ছায়ার মতো শেখরকে ধাওয়া করে।

ডানদিকের গলি।

তারপর বাঁদিক।

এইবার সোজা।

মাঠ। মাঠের ধারের সরু রাস্তা।

রাস্তায় লোকজন বেশী নাই।

দূরে অশ্বত্থ গাছের নীচে তিনটি লোক।

তাহারা শেখরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শেখর ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিল। একতা চাই। কিন্তু কি করে হবে? ঘরের ভিতরে ঘর তার ভিতরে ঘর তার ভিতরে ঘর। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শী, শিখ। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মাঝে বৈদ্য। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আবার রকমারি ব্যাপার। কায়স্থ—উত্তররাঢ়ি, দক্ষিণরাঢ়ি। শূদ্রের মধ্যে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য। মুসলমানের মধ্যে সিয়া, সুন্নি। ঘরের ভিতরে ঘর তার ভিতরে ঘর। ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ। নিজের নিজের প্রয়োজনকে স্বার্থপরেরা ঈশ্বর, জন্মান্তর আর পাপ পুণ্যের নজির দেখিয়ে কায়েম করে তুলেছে। কারণ তারা দেশের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। কমরেড মন—কি করে একতা আসবে? বিপ্লব। ভেঙে ফেল এই ভেদাভেদ। সাম্যবাদ তা করবে। ধর্ম নয় সংস্কার নয়। যে ধর্মে মানুষে মানুষে একতা বাড়ায় না তা ধর্ম নয় অধর্ম। সাম্যবাদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এক হও ভাই মানুষেরা। আবার সন্ধ্যার ছায়ায় স্বপ্নময় অনুভূতি। দূরে আকাশের বুকে পঞ্চভূতের ইন্দ্রজাল। আঃ, কি সুন্দর! এক হও। শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ আর বাদামীবর্ণের মানুষেরা এক হও। সর্ববর্ণের রামধনু আমার স্বপ্নে। কিন্তু অনেক শত্রু। নাজিবাদ, ফ্যাসিবাদ। জার্মান দৈত্য আর জাপানী বামন। রাশিয়ার অবস্থা সঙিন। কিন্তু সাহস রাখ কমরেডগণ! তোমাদের সঙ্গীন তোমাদের সঙিন অবস্থাকে দূর করবে! তোমাদের আত্মার

শক্তি দুর্জয় কারণ তোমাদের আদর্শে সত্য আছে। দৈত্যের দল বজ্রাঘাতে মরবে (দধিচীরা অস্থিদামের জন্য ধ্যানে বসেছে), বামনেরা এবার পীতমৃত্তিকায় সমাধিস্থ হবে (আমরা তাদের কফিন তৈরী করছি।)— পৃথিবীর মানুষেরা—শোন—এক হও। ভাই মজুরেরা, গান গাও। শুনছি ; হাতুড়ীর আঘাতে অগ্নিদগ্ধ লোহা গান গাইছে। কাস্তের ধারাল মুখে কর্তিত ফসলেরা শিস দিচ্ছে—একি ! এ কারা এসে আমায় ধরছে ? একি —এযে সেই গুণ্ডাটা !

মুহূর্তের ঘটনা।

চারজনে মিলিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল। আসরফ্ আর গঙ্গাপ্রসাদ দুই হাত, পরেশ তাহার গলা। সামনে সামসু।

"কি চাও ভাই তোমরা ?" অর্ধোচ্চারিত কণ্ঠের উক্তি শোনা গেল।

উত্তরে কেহ কিছু বলিল না। কেবল সামসুর ডান হাতটি উপরে উঠিয়া শেখরের পাঁজরে, কাঁধে আর বুকে একটি ছোরা বারংবার বসাইয়া দিল।

একটা তীব্র বেদনা। রক্তের স্রোত। আর্তনাদ রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ বন্ধ।

"বাঁচাও—কোই হ্যায় জী—খুন কিয়া—খুন কিয়া—" বিস্ফারিত নেত্রে উন্মাদিনীর মতো কলাবতী দূরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

"আরে চল—ভাগ"—সামসু বলিল।

এক মিনিট কাটিল।

রাস্তায় আর কেহ নাই, কেবল দুইটি প্রাণী।

একটি তরুণীর ক্রোড়ে একজন মুমূর্ষু।

কলাবতী কাঁদে, আকুল হইয়া, আর ডাকে—"বাবুজী—বাবুজী—"

শেখর একবার চোখ মেলিল, ঘোলাটে নিষ্প্রভ দৃষ্টি। ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার ঠোঁটের কোণে।

সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "উঃ—কলাবতী—"

কলাবতী তাহার মুখের উপর মুখ লইয়া কাঁদিয়া ডাকিল—"বাবুজী—ও বাবুজী, ভয় পেয়ো না, এক্ষুণি কেউ না কেউ এসে পড়বে—"

শেখর চোখ বুজিল।

কলাবতী এদিক-ওদিক তাকায়। উঃ কত রক্ত! উঃ কত রক্ত! শাড়ির আঁচল ছিঁড়িয়া সে শেখরের ক্ষতমুখ বাঁধে।

"কে আছ গো—বাঁচাও, খুন হয়েছে—" সে আবার চিৎকার করিয়া ডাকিল।

আবার সে শেখরের মুখরে দিকে চাহিয়া ডাকিল, "বাবুজী—ও বাবুজী—শুনছ—"

শেখরের ঠোঁট নড়িল কিন্তু কোনোও কথা, কোনোও শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

কলাবতী কাঁদিয়া বলিল, "ও আমার লাল, বল না কী বলছ; কষ্ট হচ্ছে বুঝি? আহা, কি করব আমি? কে কোথায় আছ—এস—বাঁচাও—"

ধূলির উপর রক্ত শুকাইতে থাকে।

রক্তাক্ত শয্যার উপর কলাবতীর বাপ্পাদিত্য শেষ কথা ভাবে। মা। মায়ের কথা মনে পড়ে সবচেয়ে আগে। মা আমার দুঃখিনী ভারতবর্ষ। মা, দিলীপ, বাবা, গোরা, উমা, দাদা। পৃথিবী সুন্দর! পৃথিবীর সঙ্গে, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমি আজ ভালোবাসায় পড়েছিলাম। উঃ, বড় কষ্ট হচ্ছে…দম নিতে পাচ্ছি না। কলাবতী ডাকছে, কাঁদছে। কম্‌রেড, আমি কথা বলতে পাচ্ছি না, আমি মরছি। শঙ্কর, কোথায় তুমি? আমি ভয় পাই নি কম্‌রেড মন, সব মানুষ এক হও। সব রক্ত পড়ে গেছে। আমার রক্তে ন্যায়ের রক্তবীজেরা আছে, তারা মরবে না। কোন মূর্খেরা আমায় মারল? কলাবতী আমায় ডকছে। মা তুমি কাঁদবে বোধ হয়। আমারও কান্না পাচ্ছে। আমি বাঁচতে চাই, কাজ করতে চাই, আমার ধর্মে সকলকে দীক্ষিত করতে চাই। এক হও। ভালোবাস। কলাবতী কাঁদছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না…পাখিরা কি—উড়ছে আকাশে? উঃ, বড় কষ্ট—আকাশের ইন্দ্রজাল কি অন্ধকারে মিশে গেছে? উঃ—দম আটকে যাচ্ছে… কম্‌রেড, আমি মরলাম…আরো মরবে…অনেক খ্রীষ্টের রক্তে মানুষের চোখ খুলবে…আমি যীশুর স্বগোত্র…আমি জয়ী। কলাবতী কি বলছে? অন্ধকার…

শেখর মরিল। কলাবতীর বীর বাপ্পাদিত্য আর শঙ্করের প্রমিথিয়ুস মারা গেল।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে তবুও একটা অস্পষ্ট আলোর ক্ষীণ আভা চারিদিকে।

"বাবুজী—বাবুজী—ও মেরি লাল—" কলাবতী ডাকিল। উত্তর নাই।

কলাবতীর কান্না থামিল। বাপ্পা মারা গিয়াছে। রাজপুতানী আর কত কাঁদিবে? পদ্মিনী আর অগ্নিকুণ্ড।

সে চুপ করিয়া শেখরের মুখের দিকে চাহিল।

দূরে তিনজনের দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। তাহার চিৎকারে তাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে।

হঠাৎ কলাবতী ঝুঁকিয়া শেখরের ওষ্ঠে চুম্বন করিল। তারপর সে শেখরের ক্ষতস্থল হইতে এক ফোঁটা রক্ত নিজের ললাটে লাগাইল।

বিচিত্র হাসি সেই অন্ধকারে তাহার মুখে খেলা করিয়া গেল।

বিড়বিড় করিয়া সে বলিল—"বাপ্পা, তুমি আমার কে জান? তুমি আমার পিতম।"

অন্ধকারে সোলাংকী রাজকুমারী আবার হাসিল। বিচিত্র হাসি।

কাহারা যেন চিৎকার করিয়া ডাকিল—"কে চেঁচিয়েছিল—কোথায়?" কলাবতী উত্তর দিল না! শক্তি নাই।

যাহারা চিৎকার করিয়াছিল তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িল।

"একি! কলাবতী!" সনাতন বলিল।

"আরে এযে শেখরবাবু।—" লক্ষ্মণ সিং বলিল।

"কে খুন করল?" বিপিন প্রশ্ন করিল।

কলাবতীর মুখে এইবার কথা ফুটিল, "চারজন ছিল, গঙ্গাও ছিল তার মধ্যে—ঐদিকে পালিয়েছে—" সে আর বলিতে পারিল না। তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। শেখরের শীতল দেহ সে আঁকড়াইয়া ধরিল। বিপিন আর সনাতন রাস্তা ধরিয়া সোজা ছুটিল।

মাঠের শেষে বাঁ দিক দিয়া তাহারা সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। রবিবারের জনাকীর্ণ রাস্তা।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে তাহারা চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া গঙ্গাপ্রসাদকে খোঁজে।

"কোথায় গেল ?" বিপিন বলিল।

"আরও এগিয়ে চল। আমরা ছাড়ব না, শেখরবাবুর খুনের প্রতিশোধ নেবই—"

"একটি পানের দোকানের পাশে গিয়া তাহারা দাঁড়াইল। সামনেই একটা সংকীর্ণ রাস্তা।

"এদিকে যাবি ?" সনাতন প্রশ্ন করিল।

"কোথায় ?"

"ভাঁটিখানায়—গঙ্গা তো তাড়িখোর।"

"চল্—"

পানের দোকানের পাশে একটি খাবারের দোকানে গঙ্গাপ্রসাদ আর পরেশ খাইতেছিল। হঠাৎ গঙ্গাপ্রসাদ চমকিয়া উঠিল। কাহারা যেন তাহার নামে কি বলিতেছে!

সে আস্তে আস্তে উঁকি মারিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সনাতন আর বিপিন। তাহারা যেন কি খুঁজিতেছে। যাক—তাহারা চলিয়া গেল।

"পরেশ—"

"কী ?"

"বোধ হয় সকলের মালুম হয়ে গেছে—"

"দূর—"

"হ্যাঁরে—বিপিন আর সনাতনকে দেখলাম।"

পরেশের মুখে অন্ধকার নামিল। সে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"চল—" একটু পরে সে বলিল।

"কোথায় ?"

"বাবুদের ওখানে—"

"সেখানে কেন—আস্‌রফ্‌ তো গেছেই সেখানে।"

"আমরাও যাব। আমাদের ধরলে বাবুরা সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা তাদের ওখানে কাজ করছিলাম।"

"ঠিক বলেছিস—চল।"

তাহারা বাস ধরিল।

বাস থামিল শ্যামবাজারের মোড়ে।

তাহারা নামিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ পরেশ বলিল—"ওই ছোকরাকে দেখছিস্‌—"

"কে?"

"ওই যে মাথা নিচু করে আস্‌ছে?"

"হ্যাঁ।"

"ও শেখরবাবুর ছোট ভাই।"

"তাই নাকি?" গঙ্গাপ্রসাদের গলাটা হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেন সে বুঝিতে পারে না। সে চাহিল। সিক্ত-জামাকাপড় পরিহিত একটি সুদর্শন যুবক কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। সে দিলীপ।

দিলীপের চক্ষু লাল, সিক্ত চুলের বোঝা ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে শ্মশান হইতে ফিরিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মহানগরীর অগ্নিদগ্ধ-মৃত্তিকা-নির্মিত অট্টালিকা ও সৌধাবলী আকাশকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু সেই আকাশ হইতেই গুড়ি গুড়ি তুষার কণার মতো রাত্রির অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িতেছে। আচ্ছাদিত আলোক-মালা-বিভূষিতা মহানগরী তাহার ছায়াময় রূপের পসরা খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধা বারবাণতার মতো। ধীরে বাতাস তাহার বুকের উপর দিয়া চলাফেরা করে। অট্টালিকার প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া অন্ধকার বিসর্পিল গলিত অন্ধের মতো বারংবার পথ হারাইয়া অনেক কষ্টে আবার সে অন্য রাস্তায় বাহির হয়। আর সেই বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়—সৌখীন ধনী পুরুষের রুমালের সুরভি আর ডাস্টবিনে স্তূপীকৃত তরিতরকারীর পচা খোসার দুর্গন্ধ; ভাসিয়া বেড়ায়—ঐশ্বর্যবতী সুন্দরীদের মুখের পাউডার,

কেশতৈল, শ্বেত দেশের এসেন্সে সুমার্জিত সুকোমল দেহসৌরভ, আর ভাসিয়া বেড়ায়—বস্তির নর্দমার গলিত.ইঁদুরের দেহগন্ধের সহিত লক্ষাধিক কর্মক্লান্ত মানুষের ঘামের গন্ধ। নানাগন্ধের রসায়ণ পানে মহানগরী উত্তেজিতা হয়। ছায়া আর আবছা আলো, হাসি আর শব্দ। মহানগরীর অপরূপ নৈশরূপ।

আবার সেই পুরাতন গলি। বাড়ির গলি।

দিলীপ গলিতে প্রবেশ করিল।

সে একবার ললাট হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিল। অসীম ভাবনার জগতে সে ডুবিয়া গিয়াছে, এত ডুবিয়া গিয়াছে যে, সে কিঁ ভাবিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে ভাবে। কিছু না, কিছু না, আমি কি ভাবছি, কিছু না, কিছু না— ওঃ—তপন মারা গেছে, পুড়ে গেছে। অন্ধকার জানালা দিয়ে কে আমায় দেখছে? কে আমার কানেব কাছে মুখ সরিয়ে এনে আমায় ডাকছে! আগুন জ্বলেছিল দাউ-দাউ করে। এই সুন্দর শরীব পুডে যায়। পঞ্চভূত। হে অগ্নি, আমি তোমার উপাসক। তুমি অপূর্ব। তপন মরেছে। সকলেই মরে, সব জিনিসই মরে। একটি ক্ষুদ্র তৃণও মরে। কিন্তু কেন? বৈচিত্র্য! বিচিত্র। কিন্তু···না, অন্ধকার। আমি কে? না ভাবব না, ভাবছি না।—সিসেম দ্বার খোল। দরজা খোলাই আছে। আমি কি বেঁচে আছি? কেউ আমার সঙ্গে কথা বলুক, নইলে আবার যেন কি হবে···কী হবে? কি ভাবছি।

"কে?" দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া ভবনাথ ভিতরের ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিল।

"আমি।" (বেঁচেছি, বাবা, তোমায় ধন্যবাদ)।

কল্যাণী দিলীপের চেহারা দেখিয়া অনুযোগ করিয়া বলিল, "কি চেহারা করেছিস বল তো, চোখমুখের একি ছিরি? যা যা, শিগগীর গিয়ে কাপড়জামা ছাড়।"

"হুঁ—"

জামা কাপড় বদলাইয়া সে বড় ঘরে গেল। উমার শিয়রে ভবনাথ বসিয়া, পাশে গোরা।

"এখন কেমন আছে খুকী ?" দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল।

ভবনাথ চিন্তিতভাবে বলিল, "জ্বর বাড়ছে—দেখ তো একবার থার্মোমিটারটা লাগিয়ে—"

দিলীপ ডাকিল, "খুকী"—(আবার কেন ভাবছি ? কিন্তু কি ভাবছি ?)

উমা ডাগর ডাগর আরক্ত চক্ষু দুইটি মেলিল, "কি ?"

"জ্বর দেখি তোর—"

থার্মোমিটারে জ্বর উঠিল ১০৩°।

"ভারি কষ্ট হচ্ছে, না রে খুকী ?"—(কে আমায় ডাকছে ? শূন্যে কার দীর্ঘনিঃশ্বাস ? মানুষেরা সবাই মরছে। ভয়ঙ্কর নির্জনতা পৃথিবীকে গ্রাস করবে, শাদা হাড়ের স্তূপের মাঝে আমাদের আত্মারা কাঁদবে—। থাম—এসব কথা ভেব না।)

উমা হাসিল, কোনও কথা বলিল না।

"সে কি রে! জ্বর তো ভয়ানক বাড়ল—কি করা উচিত ?" ভবনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

"আর হোমিওপ্যাথী করালে চলবে না"—দিলীপ মাথা নাড়িল।

"তবে ?"

"হরিশ ডাক্তারকে ডাকতে হয়।"

"কিন্তু টাকা ?" (ভগবান—না, ভগবান নেই। টাকা চাই। কি করি এখন ? আহা, মা আমার শুকিয়ে গেছে।)

কল্যাণী বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়াছিল এইবার ভিতরে আসিয়া বলিল, "টাকার জন্যে ভাবলে চলবে না। আজ শেখর দুটো টাকা দিলীপের হাত দিয়ে পাঠিয়েছে, তাই দিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।" (আমি গরিবের ঘরণী—তাতে কি ? আমার ছেলেরা ? বেঁচে থাক ওরা—ওরা বড় হৃদয় নিয়ে জন্মেছে—ওরা যুগকে বদলাতে এসেছে, টাকার জন্যে জন্মায় নি। শেখরটা কখন যে আসবে—একেবারে পাগল। যেমন বাপ তেমনি ছেলেরা। ঐ দেখ না, ঐ বুড়ো পাগলকে দুপুরে যেই বলেছি, 'মাপ করো গো'—অমনি মুখে হাসি—)

"তাই নাকি?" ভবনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

"হ্যাঁ"—(শেখরের জন্যে আজ মাছের মুড়োটা রেখে দেব। ও যে কখন খায়, কখন ঘুমায়—কিছুই ঠিক নেই, খালি কাজ আর কাজ।)

"তবে আমি ঘুরেই আসি, কি বল?" (না, ভগবান আছে। মেয়েটার অসুখ সারাও ভগবান, দারিদ্র্যের সঙ্গে অসুখ বড় কষ্টকর—)

"আমি না আসা পর্যন্ত থাকিস রে দিলীপ।"

"আচ্ছা।"

ভবনাথ দিলীপের দিকে জামা পরিতে পরিতে চাহিল। আমার ছেলে-মেয়েগুলো সবাই অদ্ভুত গাম্ভীর্যের পাহাড়। কি ওদের ভাবনা? দিলীপটা বড় বেশী ভাবে, দুএকটা কথাও বলতে চায় না। শেখর তবু তা করে, কিন্তু দিলীপ একেবারে আলাদা অনেকটা প্রমথর মতো (কোথায় আমার সেই দুর্দান্ত ছেলে? কান্না পায়, বুকটা হুহু করে।) ও যেন আকাশের দেবতা। ওর চিন্তা, ওর অনুভূতি সবই যেন আকাশের দুর্বোধ্য রহস্যে নির্মিত; ওর নাগাল পাওয়া ভার।

ভবনাথ বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী বলিল, "তুই বোস রে খোকা, আমি রান্নাটা দেখিগে।"

"আচ্ছা।"

গোরা একবার দাদার দিকে, একবার দিদির দিকে তাকায়। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে; নির্বোধ মূক পশুর মতো সে অনুভব করে যে পেটের মধ্যে……একটা রিক্ততা ক্রমেই আগুনের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সে আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরের দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু কল্যাণী তাহার উপস্থিতি বুঝিতে পারিল, বোবা ছেলেকে দেখিয়া তাহার হৃদয় মমতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আদর করিয়া সে ডাকিল, "গোরা নাকি? আয় বাবা—নে, এই পিঁড়িটাতে বোস (আহা, ভোরবেলায় কত বকেছি), একটু পরেই তোকে খেতে দেব, কেমন? (আজ খালি শেখরের মুখটা ভেসে উঠছে চোখের

সামনে। ছেলে আমার মাকে ভোলে নি, সংসারের কথাও সে ভাবে, তাই টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোরা বেঁচে থাক—আরো বড় হ', সুখী হ'।)

গোরা মাথা নাড়িল। আচ্ছা।

কল্যাণী মাছের তবকারী রাঁধিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র রান্নাঘরের ভিতর তরকারীর গন্ধ ভাসিয়া বেড়ায়। গোরা তাহা নিশ্বাসের সহিত টানে। কোনও কিছু বলিতে তাহার ভয় হয়। দিদির অসুখ, সংসারের অভাব মায়ের মনকে যে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা সে বোঝে।

খানিক পরে বাহিরে ভবনাথের ডাক শোনা গেল, "ওরে গোরা, ডাক্তারবাবু এসেছেন রে—"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "যা তো বাবা, ও ঘরে যা।"

গোরা নিঃশব্দে আবার উঠিয়া গেল।

বড় ঘরে তখন ভবনাথ ডাক্তারকে লইয়া আসিয়াছে।

হরিশ ডাক্তার মাঝারি রকমের লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সাহেবী পোশাক-পরিহিত, বয়স তাহার প্রায় পঁয়ত্রিশ, মোট কথায় বেশ আকর্ষণীয় তাহার চেহারা। আর তাহার পসারও আজকাল মন্দ নয়।

দিলীপকে দেখিয়া ডাক্তার বলিল, "হ্যালো, আপনি এখানে!"

দিলীপ মাথা নাড়িল, "হ্যাঁ এইটেই আমার বাড়ি।"

"বটে! বেশ—বেশ, তা আজকাল নতুন কিছু লিখছেন নাকি?"

"চেষ্টায় আছি।"

"বাই দি বাই, আপনার সদ্য-প্রকাশিত একটি গল্প পড়েছি, সেদিন, রিয়েলি—ইউনিক।"

"ধন্যবাদ!"

"যাক—now to my duty, এই বুঝি পেসেণ্ট?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ভবনাথ বলিল।

রোগিণীকে দেখিয়া হরিশ ডাক্তারের পঁয়ত্রিশ বৎসরের জীবনে বিপ্লব

ঘটিল, তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। সত্যকারের রূপ, অত্যদ্ভুত সৌন্দর্য দেখার মতো বড় ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে আর নাই। হরিশ ডাক্তার বহু সুন্দরী দেখিয়াছে,—কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া—বহু রকমের বহু দেশীয়া সুন্দরীদের মিছিলে সে কতবার পথ হারাইয়াছে, নিজের জীবনে কতবার তাহাদের ছায়াপাতও ঘটিয়াছে, কিন্তু উমার মতো এমন সুন্দরী ইতিপূর্বে আর সে দেখে নাই। হরিশ ডাক্তার নিজের মুগ্ধ মনকে বিচার করিতে করিতে ভাবে যে হয়তো ইহা তাহাব চোখের ধাঁধাঁ। মাঝে মাঝে তুচ্ছ ও অসুন্দর জিনিসকেও সুন্দর ও অসামান্য মনে হয়, কিংবা হয়তো সন্ধ্যাকালীন প্রকৃতির রহস্যময় স্পর্শে এই রোগিনীর রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সত্যই কি তাই? সে উমার দিকে চাহিল। উমার দেহ হইতে বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আসিয়া হরিশ ডাক্তারকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। ধাঁধাঁ নয়, রূপান্তর নয়, সত্য।

হরিশ ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিল। লুসি, ললিতা, জেসী, জোহরা, ফুলকুমারী—ঘরটা ভারি গরম, না?

দিলীপের মস্তিষ্কের ইতিহাস: তুমি কে? হে ছায়াময় কায়া, কেন তুমি আমার পিছনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল? হে বীভৎস, আমি মুক্তি চাই। এই ব্যাধি, এই দুঃখ, এই জন্মান্তর-জ্বালা—সংসারকে পরিত্যাগ কর সিদ্ধার্থ। থাকুক সুন্দরীরা ঘুমিয়ে—অন্ধকারে রাজলক্ষ্মী কাঁদুক। মায়া মায়া। তুমি কে, আমি কে? কে ব্রহ্মা? কে ব্রহ্মার স্রষ্টা? কে সেই ব্রহ্মার স্রষ্টার স্রষ্টা? ভাব ভাব, ভাব আর পাগল হও। মায়া। তাই কি? সকলি মায়া? আসে থাকে আর মিলে যায়? মায়া নয়—নিজের বুকের স্পন্দন অনুভব কর। আমার অন্তরের দেহলীতে কারা যেন বিলাপ করছে। কেন? গঙ্গায় আজও যেন তরঙ্গ ছিল কিন্তু আকাশে চাঁদ ছিল না। দেহ নামক এই বিচিত্র যন্ত্রের মাংস মোমের মতো আজ গলে গেছে। মৃত্যু। 'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল মৃত্যুদূত চুপে চুপে'—

"দেখি হাতটা, ডানটা নয়"—হরিশ ডাক্তার বলিল।

উমা ডাক্তারের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বাম হাতটি

বাড়াইয়া দিল। নাড়ী দ্রুত। কি সুখস্পর্শ হাত মেয়েটির! ডাক্তার তাহা চাপিয়া ধরিল, সেই সুগৌর, সুডোল হাতের কোমল উত্তাপ ডাক্তারের করতলের অসংখ্য অদৃশ্য রন্ধ্র দিয়া তাহার দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে এক অবশ উত্তেজনায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

দিলীপ ভাবিতেছে, গোরা আর ভবনাথ নিঃশব্দে দেখিতেছে। দ্বারপ্রান্তে কল্যাণীর মাতৃহৃদয়ে অনেক কথার কলরব।

"এইটে মুখে নাও তো"—ডাক্তার উমার মুখে থার্মোমিটার দিল।

ডাক্তার উমার দিকে আরও ভালোভাবে চাহিল। মেয়েটার ঠোঁট দুটো কি লাল! জ্বরের আধিক্যে তা আরও লাল হয়েছে। বাঁকা ঠোঁট মদনদেবের ধনুকের মত (হরিশ ডাক্তারের প্রাণে কবিতা জাগিয়াছে)। কনকচাঁপার মতো সুন্দর চামড়া এত পাতলা যে, নিচের রক্তস্রোতকেও যেন দেখা যায়; এমন একটা উগ্র লাবণ্য সারা ত্বকে যে, দেখতে দেখতে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। (ডাক্তারের তাহার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে—মোটা, তিনটি সন্তানের জননী সতীসাধ্বীদের আদর্শে অনুপ্রেরিত একজন সেন্টিমেণ্টাল স্ত্রীলোক।) আর মেয়েটির চোখ দুটো? মধ্যাহ্ন শান্ত ও গভীর দীঘির কালো জলের মতো। পদ্মফুলে ভরা দীঘির মতো। তার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলাও, তুমি ডুবে যাবে। মুহূর্তে তোমার অস্তিত্বের চারিদিকে বিস্মৃতির একটা সুবিশাল সুশীতল শূন্যতা গড়ে উঠবে। সুন্দর।

একপার্শ্বে মাথা হেলাইয়া একমাথা রুক্ষ, কালো চুলের রাশি এলাইয়া উমা শুইয়া আছে।

ডাক্তার আবার রুমাল দিয়া মুখ মুছিল। ক্যাথারিনের কালো চুল, মীরার ঠোঁট, তারার কটিদেশ আর এই মেয়েটির সারা দেহ—ঘরটা ভারি গরম, না?

বায়ুস্তরে দিলীপের মনের অশ্রুত কথা:—মনে পড়ে—ঐ গোরার মতো, বয়সে কত স্বপ্ন দেখতাম। রাজপুত্রের অসির আস্ফালনে সব অন্যায় আর অসুন্দর দৈত্যেরা নিশ্চিহ্ন হত। ভেবেছিলাম বড় হয়ে অমনিভাবে সব অন্যায়, সব অত্যাচার দূর করব, নূতন প্রাণের সৃষ্টি করে এই চিরযৌবনা

জয়ন্তীর অন্তরের জরা দূর করব। (তপন।) কিন্তু সকলেই দৈত্য, সকলেই রাক্ষস। কি করি? সোনালী স্বর্ণরশ্মিতে স্বর্গ-স্বপ্ন দেখতাম। না, ভোল এসব কথা হে আমার ক্ষিপ্ত আত্মা—

'পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন-গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে।'

কি ভাবছি আমি? মাথা আবার ফেটে যাবে। থাম। উমা বড় কষ্ট পাচ্ছে। নারী। বীণা। কেন মনে পড়ে মেয়েটির কথা? ভোল। কাম কামনায় সকলেই অন্ধ। নিছক প্রেমের সময় নেই হে নারী। পৌরুষহীন বীর্য, কর্মহীন কামনা, সংযমহীন কাম আমি ঘৃণা করি।

"জর এখন ১০৩'৪ ডিগ্রী।" হরিশ ডাক্তার বলিল।

"জর দেখছি আরও বেড়েছে—" ভবনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিল। (ভগবান দয়া কর, এই নাগপাশ থেকে আমায় মুক্ত কর।)

"হুঁ, এবার বুকটা দেখতে হবে।"

বুকের উপর হইতে আঁচলটা সরাইয়া ডাক্তার উমার বুকে স্টেথিসকোপ বসাইল। তাহার হাত একটু কাঁপিয়া উঠিল।

উমা একবার নড়িয়া উঠিল, একবার চক্ষু বুজিয়া পরে আবার পিতার মুখের দিকে চাহিল।

উমার বুকের শব্দ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার তাহার যৌবন-পরিপুষ্ট দেহের রেখায় দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। উমার উন্নত বক্ষ, দুইটি নাতিক্ষুদ্র ও দৃঢ় স্তন। তাহাদের মধ্যবর্তী উপত্যকা ব্লাউজের ঊর্ধ্বাংশের মধ্য হইতে দেখা যায়। বুক পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারের হাত হঠাৎ তাহার বামদিকের স্তনকে স্পর্শ করিল। স্টেথিসকোপের নল বাহিয়া উমার বুকের হঠাৎ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধুকধুক শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল।

ডাক্তারের বক্ষস্পন্দনও দ্রুত হইয়া উঠিল। না, মেয়েটা অদ্ভুত রকমের সুন্দরী—ঘরটা ভারি গরম, না?

আর উমা? বুকের উপর ডাক্তারের হাতের মৃদু চাপ অনুভব করিয়া সে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মুখটা ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার দীঘির জলের মতো শান্ত, গভীর চাহনির ভিতরে যেন এইবার সামুদ্রিক বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিল। সেই দৃষ্টি দিয়া সে হরিশ ডাক্তারের মর্মস্থলের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার নিষ্পাপ মুখে এক ঘৃণামিশ্রিত করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। ডাক্তার অস্বস্তিবোধ করে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আরও গুটিকয়েক প্রশ্ন শেষে বাহিরে আসিয়া হরিশ ডাক্তার ভবনাথকে বলিল, "টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—অবশ্য এখনও ভয়ের কিছু নেই, তবে সাবধান হতে হবে। একটা চার্ট তৈরী করে তাতে তিনঘণ্টা অন্তর অন্তর টেম্পারেচার নোট করবেন। এবার চলুন আমার সঙ্গে, একটা ওষুধ নিয়ে আসবেন।"

"খাবে কি?" ভবনাথের গলা কাঁপে, "আমার একটি মাত্র মেয়ে, আমার বাড়ির লক্ষ্মীর পট—"

"আপাততঃ বার্লি, পরে অবস্থা বুঝে অন্য কিছু দেওয়া যাবে।"

ভবনাথ দিলীপকে বলিল, "খোকা, আমি চললাম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।"

তাহারা চলিয়া গেল।

কল্যাণী ভিতরে আসিয়া মেয়ের শিয়রে বসিল।

"কিরে খুকি, বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না মা?"

উমা মাথা নাড়িল, একটু হাসিল, "আমার মরতে ইচ্ছে করছে মা—"

"ষাট্ ষাট্—কি যে বলিস পাগলের মতো—" আশংকায় কল্যাণী কাতর হইয়া উঠিল। নত হইয়া সে উমার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিল—"মরব তো আমি আগে—"

উমা নিঃশব্দে হাসিয়া মায়ের হাতে মুখ লুকাইল।

হঠাৎ দিলীপের যেন চমক ভাঙিল, "মা—" (ভালো লাগছে না)।

"কি ?"

"আমি বাইরে যাচ্ছি।"

"কোথায় ? পড়াতে ?"

"না—এমনি।"

"তাড়াতাড়ি আসিস বাবা।"

"হুঁ—"

রাস্তা।

শব্দ।

আলোর প্রেত!

হাসি।

কলরব।

নারী। রঞ্জিত ওষ্ঠ, পাউডার ভস্ম-বিভূষিত মুখ, নিতম্বের গতিছন্দ। পুরুষ দৃষ্টি। ঊর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী, তির্যক, বক্র, কামাতুর। দিলীপ হাসে। **Man is a rational animal.** না **Man is a carnal animal.**

রাস্তা।

ট্রাম, বাস, রিক্সা, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকের বিদ্যুৎ ঝলক। ভিখারীর নগ্নতা, জ্যোতিষীর আহ্বান, অট্টালিকার আড়ালে হাতছানি।

"বন্দে মাতরম্—" সহস্র লোকের জনতা।

"সাম্রাজ্যবাদ নাশ হো—" রাস্তা কাঁপিয়া উঠিল।

দিলীপ চমকিয়া দাঁড়াইল। বিরাট মিছিল দূরে আসিতেছে।

"বন্দে মাতরম্—"

"মহাত্মা গান্ধী কি জয়—"

রাস্তার লোকেরা উত্তেজিত হইতেছে। বাতায়নে, বারান্দায় কৌতূহলী মুখ।

"বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক—" আবার ধ্বনিত হইল।

দিলীপের চোখে জল আসিল। ত্রিবর্ণ পতাকা-বাহী জনতার গম্ভীর গর্জন তাহার মর্মকোষে এক অনলস্রাবী জ্বালা ধরাইয়া দিল।

সে দেখে। যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, শিশু, নর, নারী, সকলে মিলিয়া চলিয়াছে। মানুষের এই আর এক রূপ। বন্দে মাতরম। মা তোমায় বন্দনা করি। শিল্পী, তোমার কর্তব্য কি? চল ভাই সব—আমি তোমাদের ভাষা দেব, তোমাদের ভাব দেব, আমি তোমাদের মশালে আগুন ধরাব। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক—নতুন সৃষ্টির জন্য বিপ্লব চাই। ভেঙে ফেল—অনেক শঠতা, অনেক প্রবঞ্চনা, অনেক মিথ্যা, অনেক কদর্যতার ইতিহাসকে ছিঁড়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল। মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি তোমার এই তো কর্তব্য। বন্দে মাতরম। হে আমার ক্ষুধিতা, শীর্ণা, নগ্না হতভাগিনী মা—তোমায় আমি প্রণাম করি। তুমি আমায় শক্তি দাও। শৃঙ্খল ভেঙে ফেল। বণিক, সতর্ক হও। অতলান্তিকের অতলে শীতল সমাধি। প্রশান্ত মহাসাগর অশান্ত হয়েছে। বোমা, বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় মানব-সভ্যতার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে—ভেঙে যাচ্ছে। চল্লিশ কোটি ক্রীতদাস, তোমাদের প্রাণে আমি আগুন জ্বালাব। হে অগ্নি, আমি তোমার উপাসক। তুমি ঈশ্বর! ঈশ্বর একটি উর্ণনাভ। চলে গেল মিছিল! আমি কেন চেঁচাতে পারলাম না! আমি কী করতে পারি? কী করা উচিত? আমার মাথাটা ভারী হয়ে উঠছে, গোলমাল হয়ে গেছে। কি ভাবছি? কি ভাবছি, কি ভাবছি? সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

'হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।'

কিন্তু সে পুরুষকে দেখে হবে কি? আমাদের স্বপ্নকে সে সার্থক করে না কেন? ভাবব না, আর ভাবব না—

মিছিল দূরে মিলাইয়া গিয়াছে।

নদী স্রোতের মতো রাজপথের সেই পুরাতন ধারা আবার প্রবাহিত হইতেছে।

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

কলেজ স্ট্রীটে একটি বারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

"দু পেগ ব্রাণ্ডি—" সে বয়কে হুকুম করিল।

ব্রাণ্ডি আসিল। তাহা নিঃশেষিত হইল।

আবার রাজপথ।

ভদ্রলোকটি একপাশে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল।

ক্লান্ত ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন ডাকিল, "গোবিন্দবাবু—"

"কে?" ভদ্রলোক মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে হারানাথ।

"কি ব্যাপার হে?" সে প্রশ্ন করিল।

"আপনার ওখানে দুবার গিয়েছিলাম আমি—"

"কেন?" ভদ্রলোক হাসিল, "আমি জানি কেন—টাকা। টাকা চাও, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, গোবিন্দবাবু—একটা টাকা, বড় অভাবে পড়েছি।"

"কিন্তু কেন দেব?" গোবিন্দ মোক্তার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "আমি কি টাকার কুমীর নাকি?"

"অন্তত আট আনাও দিন...."

"এক আনাও না—আমার কাছে নেই।"

"সত্যি বড় দরকার—" অসহায় কণ্ঠে হারানাথ বলিল, "না হয় চার আনাই দিন গোবিন্দবাবু—"

"এক পয়সাও না। তোমার কাছে এখনও চল্লিশ টাকা পাই, তা কবে দিচ্ছ?"

হারানাথ জবাব দিতে পারে না। দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয় কিন্তু তবু কাঁদিতে পারে না। পেটে ভাত নাই যে।

গোবিন্দ মোক্তার হারানাথকে একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, "হারানাথ, তুমি আরও টাকা পেতে পার, এমন কি মাসে মাসেও তোমায় আমি কিছু দেব।"

হারানাথ শিহরিয়া উঠে। জ্বালাময় দৃষ্টি মেলিয়া সে মোক্তারের মুখের দিকে চাহিল।

মোক্তার মাথা নাড়িল, "হ্যাঁ মিথ্যে কথা নয়, সত্যি বলছি, দেব আমি তোমায়—কিন্তু কেন তা তো জান ?"

হঠাৎ মনে মনে এক মুহূর্তে কি স্থির করিয়া লইয়া হারানাথ বলিল—"হ্যাঁ—"

"তবে কী বলতে চাও তুমি, রাজী ?"

"হ্যাঁ—রাজী, চলুন।" (বাঁচতে হবে, সহস্র অপমান সহ্য করেও, মেয়ের পবিত্রতা কলুষিত করেও বাঁচতে হবে। পাপ ? বড় ক্ষিদে পেয়েছে।)

"বেশ-বেশ, এই ট্যাক্সি—"

ট্যাক্সি থামিল।

কলুটোলা স্ট্রীটের একটি গলিতে পুরাতন বাড়ির একাংশ।

হারানাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দাঁড়ান—দেখে আসি সব—"

"আচ্ছা—"

হারানাথ ভিতরে গেল। সুষমার মা ঠাকুর ঘরে পূজা করিতেছে। পুজো! ঝ্যাঁটা মার। ওসব পটের ছবির কেরামতি জানা আছে। শয়তানেরাই চিরকাল জেতে। পাপীরাই চিরদিন বাঁচে। সুষমা কোথায় ? ওঃ, ঘরে। বিছানার উপর নিজের রাজকন্যার মতো সুন্দর অথচ ক্ষুৎকাতর দেহ এলিয়ে পড়ে আছে।

সে বাহিরে গেল।

"কি খবর ?" ফিসফিস করিয়া মত্তকণ্ঠে গোবিন্দ প্রশ্ন করিল। উত্তেজনায় তাহার চোখ জানোয়ারের চোখের মতো জ্বলিতেছে।

হারানাথ বুঝিল যে মোক্তার নেশা করিয়াছে। একটা অন্ধ নেশা হারানাথকেও পাইয়া বসিয়াছে। বাঁচিবার নেশা।

সে মাথা নাড়িল,—"চুপ—আমার পেছনে পেছনে আসুন—আর দেখুন, ও তো তেমন মেয়ে নয়, হয়তো কাঁদবে বাধা দেবে—"

"ঠিক হয়ে যাবে—কিস্যু বলতে হবে না।" মোক্তার হাসিল।

"আর—আর—গিয়েই দরজা বন্ধ করে দেবেন"—(আমি মানুষ, আমি মানুষ, আমি মানুষ—)

শয়নকক্ষের দরজার নিকটে গিয়া হারানাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"যান—"

গোবিন্দ মোক্তার পা টিপিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল।

হারানাথ ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো নিজের মাথার চুল ধরিয়া কয়েকবার টানিল।

ভিতরে সুষমার আর্তনাদ—"বাবা গো—মা—"

কানে হাত দিয়া হারানাথ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। আবার ভিতরে অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল—"মা—মা গো—"

পূজার ঘর হইতে সুষমার মা ছুটিযা আসিল।

"কি হল গো সুষমার?" সে জিজ্ঞাসা করিল।

"চুপ—"

"কেন?"

"ঘরে লোক আছে।"

"কে? কেন?"

হারানাথ হাসিল, অস্বাভাবিক হাসি, "বাপ ছেলে মেয়েকে খাওয়ায়, না? কিন্তু বাপ যখন আর পারে না তখন সে ছেলেমেয়ের উপার্জনে বাঁচে। বাঁচা তার চাই—ই। তাই আজ আমি গোবিন্দ মোক্তারকে সুষমার ঘরে পাঠিয়েছি—"

"কি! কি বললে তুমি!"

আবার ঘরের ভিতর একটা শব্দ! গোঁ গোঁ শব্দ।

"তুমি কি পাগল, তুমি কি জানোয়ার"—সুষমার মা চিৎকার করিয়া উঠিল।

"আমি মানুষ।" দাঁতে দাঁতে চাপিয়া হারানাথ উচ্চারণ করিল।

"সরে দাঁড়াও।"—উন্মাদিনীর মতো সুষমার মা দরজার দিকে দৌড়াইল।

হঠাৎ হারানাথ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, স্ত্রীর দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার গলদেশ দুই হস্তে নিপীড়ন করিয়া বলিল—"চুপ বলছি! জান যে পৃথিবীতে খিদে আছে, দুঃখ আছে তবু কেন নিজের গর্ভপাত করাও নি—খবরদার, একটা কথা বললেই খুন করে ফেলব—চুপ—"

খাদ্যহীন রান্নাঘর হইতে একটি মিশমিশে কালো বিড়াল বাহির হইয়া আসিল। একবার সে এদিকে ওদিকে চাহিয়া পরে দ্রুতপদে গলিতে বাহির হইল।

গলি অন্ধকার। উপরের আকাশও তেমনি অন্ধকার।

অন্ধকারের মধ্যে কালো বিড়ালের দুইটি জ্বলন্ত চক্ষু জ্বলজ্বল করে।

কিসের যেন একটি শব্দ! বিড়ালটি দাঁড়াইল। পরে আবার সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

রাজপথের মোড়ে গিয়া সে আবার দাঁড়াইল। মোড়ের একটি রেস্তঁরা হইতে মাংসের গন্ধ আসিতেছে। জিহ্বা দিয়া বিড়ালটি একবার নাসিকা লেহন করিল। তাহার মস্তিষ্কের অন্ধকারে কত কি চলা-ফেরা করে বোঝা যায় না, সে নিজেও বোঝে না।

দূরে একটি কুকুর বসিয়া রাজপথের লোকজনদের গতিবিধি তীক্ষ্ণদৃষ্টি গোয়েন্দার মতো লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ সে কালো বিড়ালটি দেখিতে পাইল। পরমুহূর্তেই তাহার পৌরুষ তাহার ক্রুদ্ধ গর্জনে নিনাদিত হইল।

বিড়ালটি উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে গিয়া একটি যুবকের পায়ে ধাক্কা খাইল। পলায়নপর বিড়ালের পশ্চাতে পশ্চাতে কুকুরটি তাহার লেজের ভগ্নাবশেষ আন্দোলিত করিতে করিতে অদৃশ্য হইল।

যুবকটি একটু হাসিয়া অগ্রসর হইল। সে খদ্দর-পরিহিত, মুসলমান।

বিচিত্র সজ্জা ও অলঙ্কারে বিভূষিতা সুচতুরা নটীর মতো বিচিত্র এই মহানগরী। তাহার চোখে অন্ধকারের কাজল।

"এই যে ইউসুফ"—আর একটি যুবক ডাকিল।

প্রথম যুবক থামিল, "সেলাম ওয়ালেকম ভাই রহমান।"

"ওয়ালেকম সেলাম—"

"তারপর কি খবর ভাই? সব ভালো তো?"

রহমান হাসিল, নিজের ছোট্ট দাড়িতে একবার হাত বুলাইয়া সে বলিল, "হ্যাঁ ভালোই, তোমরা এবার কি করবে?"

ইউসুফ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"তোমাদের গান্ধী, মৌলানা—এদের তো আটক করা হল এবার?"

ইউসুফের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, "এবার লড়াই হবে।"

"লড়াই। কার সঙ্গে কার?"

"পার্থিব শক্তির সঙ্গে আত্মার।"

রহমান হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"হাসছ! কিন্তু তুমি তো জান, মানুষের সব কর্মের মূলেই আত্মার প্রেরণা থাকে। চল্লিশ কোটি আত্মার সম্মিলিত কামনা পার্থিব শক্তিকে পরাস্ত করবে।"

"চল্লিশ কোটি থেকে কয়েক কোটি বাদ দাও ইউসুফ—"

"কাদের?"

"মুসলমানদের।"

"কেন?"

"হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের মিল হবে না।"

"কেন হবে না?"

"ধর্ম।"

"ধর্ম তো মানুষের গড়া—তাছাড়া আমাদের ধর্ম তো মানুষকে ঘৃণা করতে বলে না।"

"কাফেরদের দলে মিশে তোমার কথাবার্তার ধরন বদলে গেছে ইউসুফ।"

"না ভাই, ভুল বললে—মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষের মতো কথা বলছি।"

"সে যাই হোক—আমরা ভারতবর্ষ জয় করেছি—আমরা চিরদিন সেই জয়ীই থাকব।"

"বটে! তা ভালো—তবে দেশকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার কর।"

রহমান চুপ করিল, একটু পরে বলিল—"সে পরের কথা—"

ইউসুফ হাসিল, "তুমি এখন যা বলবে তা জানি ভাই। আমি মুসলমান হয়েও মুসলিম লীগের সদস্য হই নি এই জন্যই। যারা ছোট স্বার্থের স্বপ্ন দেখে তারা বড় স্বার্থের উপযুক্ত নয়।"

"খুব বড় বড় কথা যে বলছ ইউসুফ, কিন্তু আমিও বলি—যতক্ষণ না পাকিস্তান বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেবে না, আর যতদিন তা না হবে ততদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে না।"

"রহমান—"

"বল—"

"তুমি কোন দেশের লোক?"

"ভারতবর্ষের।"

"তোমার দেশ তবে ভারতবর্ষ?"

"নিশ্চয়ই।"

"বেশ। আচ্ছা রহমান—"

"কি?"

"এক মা—তার দুই ছেলে। দুই ছেলেই মাকে ভালোবাসে, মাও ভালোবাসেন। এখন একটি ছেলে যদি তাতে খুশী না হয়ে মাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলে তবে সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

রহমান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, "কার সঙ্গে কার তুলনা, মা আর দেশ এক হল?"

"দেশ মায়ের চেয়েও বড়। মা জন্ম দেয়, দেশ দেয় আমাকে জীবন।"

"তুমি একেবারে কাফের হয়ে গেছ ইউসুফ—"

"কেন?"

"দেশকে তুমি মা বলছ? এ তো পোত্তলিকতা।"

"তবে মাকে আর মা বলো না, বাবাকে আর বাবা বলো না রহমান—ওটাও পৌত্তলিকতা।"

রহমানের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল কটমট করিয়া ইউসুফের দিকে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা চল্লাম—আমার অনেক কাজ আছে—"

"আচ্ছা ভাই সেলাম—"

রহমান বিপরীত পথে চলিয়া গেল।

ইউসুফ ম্লান হাসি হাসিল। যুক্তি মানবে না। ভাই মুসলমান যুক্তি মান, সত্যকে সত্য বল। ভারতবর্ষ আমার মা। মা, তোমার শৃঙ্খল আমরা ভাঙব —নিশ্চয় ভাঙব। আরো শিক্ষা চাই—আরো জ্ঞান। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে হবে, মৌলবীদের মিথ্যা প্রচারের কুয়াশাকে ছিন্ন করতে হবে। বন্দী করবে? কর—আমার আত্মার দুর্জয় গতি তোমাদের সুদৃঢ় কারা-প্রাচীরকে চুরমার করে দেবে।

"কি দোস্ত্—কি ভাবতে ভাবতে চলেছ?" ইউসুফ ডাকিল।

তাহার ডাকে চশমা-পরিহিত একটি মুসলমান যুবক থামিল।

"কি রে আলি? কোথায় যাচ্ছিস?"

"যাচ্ছি একটু সুমন্তর ওখানে।"

"মিটিং?"

"হ্যাঁ, আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টির আজ মিটিং—"

"তা জানি—"

"তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"কংগ্রেস আফিস—"

"বেশ—ইনকিলাব—"

"জিন্দাবাদ—"

ইউসুফ চলিয়া গেল।

আলি হাতঘড়ি দেখিয়া কি যেন ভাবিল, পরে একটি বাসে চড়িল।

বাস থামিল ধর্মতলায়।

গলি।

একটি বাড়ি।

"চিয়াং—চিয়াং—"

"কে?"

"আমি—আলি।"

"ভেতরে এস।"

একজন চীনা যুবক সহাস্যমুখে আলিকে অভ্যর্থনা করিল।

"এস আলি—খবর আছে।" চিয়াং বাংলা বলিতে পারে।

"কি ?"

"পরশু দিন দেশে যাচ্ছি—"

"কেন ?"

"দেশ আমাকে চায়।"

আলি একবার নিঃশব্দে চিয়াং-এর মুখের দিকে চাহিল। তাহার ক্ষুদ্র ও স্তিমিত চোখে চীনদেশের পীত মৃত্তিকার স্বপ্ন, তাহার বুকে দূর দ্বীপবাসী বামনদের উদ্যত সঙীনের ভ্রূকুটিকে ব্যর্থ করার প্রতিজ্ঞা।

"তা বেশ, আজকে মিটিং-এ আছ তো ?—"

"আমি তো এখনই যাচ্ছিলাম—"

"তবে আমি এগোই—জর্জকে খবর দিতে হবে।"

"আচ্ছা।"

আলি বাহির হইল।

পাঁচ মিনিট পরে আর একটি গলির মোড়ে অবস্থিত বাড়ির দ্বিতলে গিয়া সে আবার ডাকিল—"জর্জ—জর্জ—"

"Who's calling—are you Ali ?"

"Yes."

জর্জ বাহির হইয়া আসিল। সাতাশ আটাশ বছর বয়স, চেহারাটা ভালোই, বড়ই চিন্তাক্লিষ্ট। সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

"Are you coming to the meeting George ?"

"Sure."

"Then so long—"

"Yah"

আলি বাহির হইয়া গেল।

"Now where are you going son ?" জর্জের মা প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা, রুগ্না।

"Oh just going out for a stroll—"

মায়ের চোখে অবিশ্বাস, ভয়, "No George, you are going to join the meeting—now, don't protest—I have heard that young man."

"Yes mother."

"Can't you leave that my son ?" মায়ের শঙ্কিত কণ্ঠস্বর।

জর্জ মায়ের দিকে চাহিল, "No mother—I can no longer turn back far I have realised the truth."

জর্জের মা চুপ করিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে নিজের কক্ষে চলিয়া গেল।

"Good night mother—I am going out."

মায়েব স্বর শোনা গেল—"Good night son."

ত্রিতল। ত্রিতলে দুইটি ফ্ল্যাট।

একটি ফ্ল্যাটে থাকে মিঃ ব্রাউন। অপবটিতে মিসেস স্মিথ।

ব্রাউনদের দরজায় করাঘাত করিয়া জর্জ ডাকিল—"Are you in Liza ?"

"Coming dear"—মিঃ ব্রাউনের মেয়ে লিজা, মানে এলিজাবেথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

লিজা দরজা খুলিল। সুন্দরী লিজা। তাহার মাথার সোনালী চুলগুলি পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত।

"I am going out on an urgent piece of business my dear. I am sorry. I won't be able to take you out to-night."

লিজার মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, "Oh I see—"

"Don't get angry darling—"

"Why no"—লিজা জর্জের কণ্ঠবেষ্টন কবিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া সে জর্জের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "George darling—"

"Yes—"

"I hear—you have turned into a communist—is that true ?"

জর্জ তাহার মুখের দিকে চহিল, ক্ষণকাল তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল —"Do you want to learn the truth Liza ?"

"Yes, darling."

"Then it's the truth Liza, I am a communist—"

লিজা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে জর্জের বুকে সে মাথা রাখিল।

"Are you afraid of me Liza ?"

"Why—why should I be ? I know it is inevitable, it is coming—"

জর্জ দুই হাতে লিজার মুখ তুলিয়া বলিল, "You are a wonderful girl Liza—no—you are an angel."

লিজা হাসিল।

"Good-night."

"Good-night dear."

জর্জের পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেল।

লিজা ভাবিতে থাকে। Yes, it is inevitable—it is—it is coming. The human soul is awaken. All men are brothers.

"Hallo, sweet one—"

রবার্ট।

"Hallo Bob—"

"I saw your man going out—are you coming out for a walk with me—eh ?"

"No—"

লিজা ভিতরে চলিয়া গেল।

রবার্ট ক্রোধে একবার তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া অন্য ফ্ল্যাটে গেল। Damn that silly girl. She thinks as if she is the only girl in this big world. Damn—vanity, my lady, all is vanity,

Me—Robert Rogers—healthy like a horse and handsome like an Apollo (am I not ?)—I care a fig about that cold fish. But still—she is a peach, ay ? All bunkum—there are plenty of ga'ls—here's Daisy and Dorothy Smith, real sports and swell—

"Hallo Bob—come in—"

"Hallo Daisy darling, wher's mum ?"

"Gone to the Ruggles."

রবার্ট ডেজীর কটিদেশ জড়াইয়া ধরিল, "Good—then the night is ours, ay honey ?',

"Yes—now—oh, leave me you rogue—let me finish my toilet."

ডেজী অন্য কক্ষে গেল।

"মেমসাব—"

একটি লুঙিপরা মুসলমান যুবক। গাড়োয়ান।

"ক্যা মাংটা ?" রবার্ট প্রশ্ন করিল।

"মেমসাবকো।"

"কৌন—বসির ?"—ডরোথি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। ডরোথি ডেজীর বড় বোন।

মুসলমান যুবকটি সেলাম জানাইল।

ডরোথি রবার্টকে বলিল—"Cheerio Bob—"

"Cheerio my sweet and all that."

ডরোথি হাসিয়া বাহিরে গেল। একপাশে মুসলমানটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, "ক্যা হ্যায়—"

"বাবু লায়া হ্যায়—"

"কয়ঠো—"

"দো।"

"চল—মিসেস ওয়াটকিন্‌স্‌কা উহা লে যাওগে—"

"জী মেম্‌সাব—"

"বাবুলোগ ক্যায়সা হ্যায় ?"

"বাঙালী সাহেব হুজুর—মালকার—"

"ঠিক হ্যায়—"

নিচে ফিটন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে দুইটি পোশাক-পরিহিত, কম্পিত-বক্ষ বঙ্গ সন্তান। ডারোথি তাহাদের মধ্যস্থলে গিয়া বসিল। উগ্র এসেন্স, পাউডার, লিপস্টিক, কসমেটিকে, আঁটসাট পোশাক আর উত্তপ্ত শ্বেতদেহের স্পর্শ। রাতের যৌবনে জোয়ার আসিয়াছে।

গাড়ি চলিল। রাজপথ।

ব্ল্যাক-আউট সেড্‌-দেওয়া আলোর তির্যক রেখার চতুর্দিকে ঘন ছায়া। আলো ও অন্ধকার। তবুও লোক চলিয়াছে। অজস্র, অসংখ্য, অগণন।

রাস্তায় দণ্ডায়মান একটি ঝকঝকে নতুন মোটরে একটি যুবক চড়িতে যাইতেছিল, হঠাৎ সে কাহাকে দেখিয়া থামিল।

"এই দিলীপ—দিলীপ—"

দিলীপ দাঁড়াইল। কে ডাকে ? তপন ? তপন, তুই মরিস নি বুঝি ? না—সবই একটা দুস্বপ্ন—একটা—

"কিরে দেখতেই পাচ্ছিস না যে....এই যে, এইদিকে..."

ওঃ, হিমাংশু। দিলীপের সহপাঠীদের মধ্যে একজন।

"কি ভাই হিমাংশু ?"

"একিরে, ভারি উদাস দেখাচ্ছে যে, ব্যাপার কি ? সত্যিকারের সাহিত্যিক হয়ে পড়েছিস দেখছি—"

দিলীপ হাসিবার চেষ্টা করিল। 'O my friends! Thus saith he that hath understanding; Shame Shame—that is the history of man.'

"তারপর, কেমন আছিস দিলীপ ?" হিমাংশু প্রশ্ন করিল।

"তপন মারা গেছে হিমাংশু—" দিলীপ বলিল। কেন বলিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

"তপন! কে?—ওঃ—by jove, আমি ভুলে গিয়েছিলাম—মনে পড়েছে বটে, সে কবিতা লিখত, না? very sad—"

দিলীপ উত্তর দিল না। মানুষের ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস—বড় লজ্জার কথা, বড় দুঃখের কথা। আমি কি ভাবছি? শূন্যের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান একটি অগ্নিপিণ্ড ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হল। পৃথিবীর জন্ম। নতুন প্রাণের স্পন্দন তার দেহে। বিরাট বিরাট পর্বত, অরণ্য আর সাগর। অতিকায় পশুদের মিছিল (তাদের ফসিল দেখেছ?)। বনমানুষের লোম ঝরে পড়ল। মানুষ। কাঁচা মাংস আর রক্তের স্বাদ। দিন কাটে। পোশাক। দিন কাটে। রাষ্ট্র। যুদ্ধ। দিন কাটে। বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান। আরো দিন কাটে। আরো বুদ্ধি। স্থল, জল, বায়ুকে জয় করা হল। তারপর? সাইরেনের আওয়াজ—ফরওয়ার্ড মার্চ—কাঁচা মাংস আর রক্তের স্বাদ। নির্জন পৃথিবী—

"যাকগে, মানুষ মরবেই—এখন কোথায় যাচ্ছিস?"

"এমনি—বেড়াচ্ছি—" নীরস কণ্ঠে দিলীপ বলিল।

"চল—আমাদের বাড়ি—"

"না—না ভাই—"

"আরে চল না—একটু গল্প করা যাবে, কদ্দিন দেখা নেই। তোরা আজকাল একটু নাম কিনেছিস কিনা তাই আমাদের কথা আর মনেই নেই।"

"বেশ—চল।" (কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করছে না হে ধনী যুবক। বন্ধু? 'বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।' তোমার সজ্জিত ঘরের বদ্ধ বায়ু আমার সহ্য হয় না। তপন। আমি অন্ধকার চাই। নির্জনতা চাই—)

তাহারা মোটরে বসিল। মোটর চলিল।

"তোর একটা গল্প সেদিন পড়লাম, latest গল্প। ভারি ভালো লাগল—আর শকুন্তলা তো mad over it"—হিমাংশু হাসিয়া বলিল।

শকুন্তলা হিমাংশুর বোন, বেথুনে বি. এ. পড়ে।

"কিন্তু একটা জিনিস ভাই—বড় morbid—and must you be so ?"

দিলীপ হিংমাশুর দিকে তাকাইল, উত্তর দিল না।

হিমাংশু সে দৃষ্টি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল, "কিছু মনে করিস না ভাই—আমার impression তাই।"

"বেশ তো"—দিলীপ বলিল। হ্যাঁ, নির্জনতা চাই। সুবিশাল, সুবিপুল নির্জনতা। কেউ কোথাও নেই, যতদূর দৃষ্টি যায়—অবাধ স্বাধীনতা। রাতের আঁধারে নিস্তরঙ্গ নির্জনতার সমুদ্রে ভেসে চল—ভেসে চল। একা। একা। এই আলো, এই হাসি, এই অর্থহীন জীবনের কোলাহল, এই উদ্দেশ্যহীন জীবনের গতি—ভালো লাগে না। নক্ষত্রদের সঙ্গে কথা কও, প্রজাপতির গানের আসরে শ্রোতা হও—আমি কি ভাবছি? আমি কাপুরুষ। পলায়নপর মন আমার। কেন চাও নির্জনতা, হে কাপুরুষ। উপায় নেই। কেন উপায় নেই! আমাদের এই ব্যর্থতা কেন? কেন এত আক্ষেপ? গলদ কোথায়? আমরা ব্যর্থ মনুষ্যত্বের ভগ্নস্তূপ। কে এই স্তূপকে একত্রিত করবে, রূপ দেবে, সুন্দর করবে? আমরা প্রত্যেকে চলছি আলাদা পথ দিয়ে। সে পথ গিয়ে শেষ হয় অনন্ত শূন্যতায়, নিষ্করুণ ব্যর্থতায়, অপরিমিত জ্বালায়। কেন?

'মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু।
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু!'

কেন? সার্থকতায় গিয়ে কেন আমাদের পথ শেষ হয় না? ভাব, ভাই মানুষ, ভাব। কেন এই দগ্ধ-ভাল? উত্তর নাই। ভেসে চল—ভেসে চল তবে—নিস্তরঙ্গ, নির্জনতার সমুদ্রে ভেসে চল। আবার! কেন পালাবে? সত্যকে দেখে ভয় পাই কেন? এই বীভৎসতা, এই কদর্যতা, অনাচার, অবিচার আর অসাম্যকে দেখে পালাব কেন? এদের দূর করতে গেলে

ওদের স্বীকারও করতে হবে। 'why so morbid ?' গল্প লিখি। লোকেরা ভয় পায়, বৃদ্ধেরা শিউরে ওঠে। ওরা চায় যা আছে তা থাক, তাকে উপেক্ষা কর, নাড়াচাড়া কর না। মূর্খের দল। যাকে দূর করতে হবে, তাকে দেখতে হবে, দেখাতে হবে ; আর ভয়াবহ বিষের কথা লোকদের বলতেই হবে। তবুও ওরা মানে না। ওদের যুক্তি আছে। শূন্যগর্ভ শব্দের অর্কেস্ট্রা। ওদের আদর্শ—অন্ধের মতো বেঁচে থাকা—কদর্যতার মধ্যে উদাসীনভাবে বেঁচে থাকা। ওদের পবিত্রতার আদর্শ নিছক দেহকে কেন্দ্র করে, মন নয়। মূর্খ ভণ্ডের দল। আমি morbid—আমি কি ভাবছি ? আমি কে ? দিলীপ। দিলীপ কে ? মানুষ কে ? একটি ক্ষুদ্র জীব। তার বিশেষত্ব কি ? পঞ্চভূতের প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, ভাস্বর তার আত্মা। সেই ঈশ্বর। ঈশ্বর কে ? খুলে ফেল—আবরণ খুলে ফেল। মুখোমুখী দাঁড়াও। আমি কি ভাবছি—আমি কি ভাবছি—কে ডাকছে ! তপন। কি বলছ ভাই ? অসংখ্য দ্রাক্ষার লোহিত রসের ফল মদিরা—অনন্ত সৌন্দর্য, সমস্ত শক্তি আর মাধুর্যের সমষ্টি ঈশ্বর। ভুল। ভুল। কি ভাবছি—আমি কি ভাবছি ?

"দিলীপ—"

"কে ? তপন ?—"

হিমাংশু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য ! তপন কোথায়—dead men don't return—নাম !"

গাড়ি থামিয়াছে। বড় অট্টালিকার সম্মুখে। হিমাংশুর বাবা শহরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার।

"ওঃ—হ্যাঁ"—দিলীপ নামিল। হ্যাঁ, dead men don't return. কিন্তু যদি ফিরে আসে ! মৃত্যু কি ? মৃত্যুর পরে কোথায় যায় সবাই—সে কোন পৃথিবী ? সেখানে কি এমনি আলো আছে, অন্ধকার আছে, এমনি স্বার্থ আর পাশবিকতার আগ্নেয়গিরি আছে ? আমি কি ভাবছি—কেন ভাবছি ?

ড্রইং-রুম।

"বোস তুই—আমি চায়ের কথা বলে আসি।"

"আচ্ছা।" (আমি ভাবব না। আমি পাগল হয়ে যাব।)

হাসির শব্দ শোনা গেল।

একটি যুবতী ও একটি যুবক।

"নমস্কার দিলীপবাবু"—শকুন্তলা বলিল। আকাশের মতো নীল শাড়ি-পরিহিতা সুঠাম-দেহী, সুন্দরী শকুন্তলা। কালিদাসের তপঃক্লিষ্টা শকুন্তলা নয়! বিলাসবতী শকুন্তলা। ইহাকে কালিদাস দেখেন নাই। বিংশ-শতাব্দীর গদ্য কাব্যের নায়িকা এই শকুন্তলা।

"নমস্কার"—দিলীপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হ্যালো দিলীপ"—সঙ্গী যুবক বলিল।

"কিরকম আছ শৈলেন?"

"শৈলেনকে আপনি চেনেন নাকি?" শকুন্তলা প্রশ্ন করিলেন। তাহার কারুকার্য-খচিত নেত্রপল্লবের কোণে অগ্নিশিখা।

"হ্যাঁ—" (কে এরা? এই ঐশ্বর্য, এই হাসি, এই রূপ: এর অর্থ কি?)

হিমাংশু ফিরিয়া আসিল।

"এই যে তোমরা এসেছ। দিলীপের latest গল্প 'প্রলাপ' পড়েছ শৈলেন?"

"না—এবাব পডব—মানে"—(শকুন্তলা, তুমি অপূর্ব। তুমি অগ্নিশিখা। তোমাকে কেন্দ্র করেই আমার জীবন—পতঙ্গের জীবন।)

শকুন্তলা দিলীপের দিকে চাহিয়া থাকে। Wonderful. Burnt Apollo, দুঃখের আগুনের স্পর্শে ভাস্বর এ্যাপোলো। চমৎকার দিলীপের চেহারা। কি ভাবছে ও? আমার সৌন্দর্য কি তুচ্ছ? কেন তাকায় না ও আমার দিকে!

"এবার পড়ব মানে?" হিমাংশু বলিল—"তাড়াতাড়ি পড়ে দেখ, চমৎকার লেখা। যে কোন western short story-র সঙ্গে ওর লেখার তুলনা চলে।"

শৈলেন একটু লজ্জা পাইল—"মানে—সময় নেই তাই, এবার পডব।"

দিলীপ চারিদিকে তাকায়। সূচ্যগ্রফলার মতো তীক্ষ্ণ শকুন্তলার দৃষ্টি। ডাকিনীর মোহিনী দৃষ্টির মতো।

শকুন্তলা বলিল, "সত্যি—চমৎকার লিখেছেন দিলীপবাবু, কিন্তু বড় কষ্ট হয়।"

"কেন ?" দিলীপ হাসিল। কষ্ট! সহানুভূতিবোধে যে কষ্ট ?

"এত দুঃখ, এত বীভৎসতা কি জীবনে সত্যি আছে দিলীপবাবু ?"

"আজ্ঞে। আপনারা তো কোনোদিন জানতে পারবেন না।" (না আর ভালো লাগছে না। এবার যাব। এখানে বাতাস নেই—বদ্ধ বায়ুর জীব এরা—আমি যাই।)

শৈলেনের এ সব কথা ভালো লাগিতেছিল না। সে কথার মোড় ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—"আজকে সিনেমা গেলে হয় না হিমাংশু ?"

"নাইট শোতে ?"

"হ্যাঁ"—

"কি আছে ?"

"আমি উঠি"—দিলীপ বলিল।

"সে কি! কোথায় যাবি—চা আসছে"—হিমাংশু বলিল।

"না।" দিলীপ উদ্ধতের মতো মাথা নাড়িল।

শকুন্তলা আহতা হইল, "আর একটু বসুন না দিলীপবাবু—আমাদের দেখা তো সহজে হয় না ?" (কি ভাবে ছেলেটা ? ওকি কিছুই বোঝে না—মানুষের জীবন নিয়ে কত কি লেখে ও—নারীর দৃষ্টির ভাষা কি ও বোঝে না!)

"না।" আবার দিলীপ বলিল।

হিমাংশু ক্ষুণ্ণ হইল, শৈলেন আশ্বস্ত হইল, শকুন্তলার চোখে অভিমানের বাষ্প পুঞ্জীভূত হইল।

"কিছু মনে করবেন না আপনারা—কিন্তু সত্যি আমার মনটা আজ ভালো নেই—আচ্ছা নমস্কার—নমস্কার—"

দিলীপ বাহিরের বারান্দায় পৌঁছাইল। আঃ।

"দিলীপবাবু—"

শকুন্তলা ডাকিতেছে।

"বলুন"—দিলীপ বলিল। আবার কেন ডাক হে অপ্সরী ? আমি পলাতক। আমার ভীরু মন। ভীরু পাখি। শৃংখলে সে ভয় পায়।

শকুন্তলা নিকটে সরিয়া আসিল। তাহার চোখে বিদ্যুতের ছায়া। সুডৌল, অনাবৃত বাহু। সর্প নির্মোকের মতো মসৃণ, ঝকঝকে।

"আবার একদিন আসবেন তো?"

"আবার?"

"হ্যাঁ—আবার—(আমি কোনোও দিন কাউকে এমন করে ডাকি নি) আসবেন তো?"

"আচ্ছা—চেষ্টা করব শকুন্তলা দেবী।" (না, আর আসব না। আমি একটা পতনোন্মুখ উপগ্রহ। এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, সমারোহ—সব থেকে দূরে সরে যাচ্ছি—অনন্ত শূন্যতার অতলে নিরন্তর পড়ে যাচ্ছি। আমি আর আসব না)।

"আচ্ছা—নমস্কার"—শকুন্তলা হাসিয়া বলিল। তাহার কণ্ঠে সঙ্গীত।

"নমস্কার।"

শকুন্তলা ভিতরে গেল। যাইবার পূর্বে একবার সে দিলীপের দিকে চাহিয়া গেল। জ্বালাময়ী, সর্বাঙ্গ-লেহনকারী, সম্মোহনী-দৃষ্টি।

রাস্তা। শকুন্তলা অমন করিয়া চাহিল কেন? কি তীব্রতা তাহার দৃষ্টিতে! হায় শকুন্তলা! তোমার দুঃখ আমি জানি অথচ তুমি তা জান না। তুমি ব্যর্থ জীব। তোমার চোখে তোমার অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ মনের ছায়া, তাই তুমি অমন করে চাইলে। সকলেই কি অমনি? বীণা? না বীণা সেরকম নয়। আকাশের বিদ্যুৎ তার চোখে, কিন্তু শকুন্তলার চোখে মানুষের তৈরী বৈদ্যুতিক আলোর ঝলক। বীণা সত্য, শকুন্তলা মিথ্যা! কিন্তু যতবার দেখা হয়, কেন আমায় শকুন্তলা ততবার অমনিভাবে ডাকে? কি চায় সে?

দিলীপ তাহার প্রশ্নের সহজ উত্তর কোনোও দিনই পাইবে না। সে তো নিজের দিকে কোনোও দিন লক্ষ্য করে নাই, সে নার্সিসাস নয়। সে দেহের রূপকে চিনে না, তাহার খোঁজও সে লয় নাই। তাহার তপস্যা দেহাতীত রূপের, যে রূপের অনুভূতিতে আত্মার মুক্তি ঘটে। সে শিল্পী। সে অনুভূতি-প্রবণ বাদ্যযন্ত্রের মতো। একটু স্পর্শ—অমনি সে ঝঙ্কার তুলিবে।

একটু দুঃখ, একটু অন্যায়, একটু অসুন্দরের প্রকাশ—অমনি সে ভয় পাইবে, শিহরিয়া উঠিবে, পাগল হইবে। সে জানে না দেহ কি। সে উপলব্ধি করে না, হয়তো করিবেও না যে সে সুপুরুষ। অজন্তা গুহার প্রাচীর চিত্রের সে যেন একটি জীবন্ত ছবি। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, টানা-টানা ভাষাভাষা দুইটি চক্ষু, খাড়া নাক, আঙুলগুলি লম্বা, পাণ্ডুর গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ নর্তকের মতো সুগঠিত দেহ তাহার। তাহার শিল্পী মনের মতোই সুন্দর, লোভনীয়। কিন্তু কোনোও দিনই সে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সে শিল্পী-মনের অনন্ত প্রশ্নের মূর্তিমান প্রতীক। কিন্তু শকুন্তলা তো দিলীপ নয়, সে দেহকে উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহার নিকট দেহ মনের চেয়েও বেশী সত্য কারণ দেহকে দেখা যায়, মনকে নয়। সে দেখে যে দিলীপ সুপুরুষ, অনুভব করে যে তাহার রূপে মাদকতা আছে, তাই সে এমন করিয়া তাহার দিকে চাহে। দিলীপ তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া ?

দিলীপ চলিতে থাকে। শকুন্তলা, তোমার কি আত্মা আছে ? তোমাদের কি আত্মা আছে ?

"হাঃ হাঃ হাঃ—হি হি হি—"

একটি নগ্ন উন্মাদ রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে একটি পুলিশ।

কোথায় যাব ? দিলীপ ভাবে। মিউজিক ক্লাব। না, বড় ভিড়। নির্জনতা চাই। গঙ্গাতীরে নির্জনতা। তপন। একটুও বাতাস নেই। একটা চাপা গরম, গুমোট ভাব যেন চারিদিকে। ঝড় উঠবে। উঠুক। কোথায় যাই ? ঠিক। রাখালের কাছে যাই। অনেকদিন দেখা হয় নি। ওকি ! পূর্বাকাশে কালো মেঘের কলঙ্ক চিড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আসুক বৃষ্টি। 'বৃষ্টি পড়ে, পাতা নড়ে'। রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যু। 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' অস্তিত্বের বিনাশই কি মৃত্যু ? মৃত্যুকে কি জয় করা যায় না ?

"Man that is born of a woman hath but a short time to live, and is full of misery. He cometh up and is cut down, like a flower, (তপন) ; he fleeth as it were a shadow, and never continueth in one stay. In the midst of life we are in death—" মিথ্যা

কথা। কিন্তু তাই কি? মাথাটা দপদপ করছে—আমি কি ভাবছি? ভোল, সব ভোল—

কলুটোলার একটি নোংরা গলিতে, একটি পুরাতন ছোট একতলা বাড়িতে রাখাল থাকে। সে সঙ্গীত-শিক্ষক।

বাড়িটা অন্ধকার। মনে হয় যেন কেহ নাই।

"রাখাল—ওরে—"

অন্ধকারের ভিতর হইতে সাড়া আসিল—"আয় রে—"

দিলীপ ভিতরে ঢুকিল।

"অন্ধকারেই শুয়ে আছিস যে?"

"হুঁ—"

"কেন?"

"মনটা ভালো নেই।"

"কি হয়েছে, কেউ মরে নি তো—" (তপনের কথা বলব নাকি? না থাক তপনকে রাখাল চিনবে না।)

"না মরে নি, কিন্তু মরতে পারে।"

"কে?"

"দিদি—তার কয়েকদিন ধরে নাকি ভারি অসুখ, কিন্তু কি যে অসুখ তা লিখতে ভাগ্নের বিদ্যেয় কুলোয় নি—"

দিলীপ চুপ করিয়া রহিল। উঃ, বড় অন্ধকার। অন্ধকারে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে কেন? কথা খুঁজে পাচ্ছি না—কিছু ভাবতে পাচ্ছি না। না, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, এত অল্পতে মাথা গরম হলে মানবসভ্যতাকে বাঁচাব কেমন করে?

রাখাল বলিয়া চলিল, "সংসারে সব বন্ধনই ছিঁড়ে গেছে, কেবল এইটিই রয়েছে—নাড়ীর বন্ধন, এ গেলেই ভালো—আমি বাঁচি।"

উত্তর নাই।

"কত জায়গায় ঘুরলাম, কতবার জীবনের মোড় ঘুরে গেল, কিন্তু একলা যাযাবর জীবনের আনন্দ আর দুঃখ কোনোটাকেই পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ

করতে পারি নি, কারণ সংসারের সঙ্গে আমার একটি যোগ আছে—আমাকে একজনের জন্য ভাবতে হয়।"

কথাটা ঠিক। রাখালের জীবন বিচিত্র। সে কবেকার কথা, সেই কৈশোরে—বাপ মা যখন এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিল তখন এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে সে ঢুকিল এক যাত্রার দলে। তাহার যাযাবর জীবন-যাত্রার সেই ভূমিকা। তাহার গলা ভালো ছিল, বছর দুয়েক বেশ কাটিল। কত নদী পার হইয়া, কত খাল বিল অতিক্রম করিয়া, কত গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, অসংখ্য লোকের মাঝে, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের কত রাত্রির ঘনীভূত স্তব্ধতায় তাহার চড়া গলার গান সে শোনাইয়াছে। কতবার সে কৃষ্ণ সাজিয়াছে, শুক সাজিয়াছে, বসন্ত সাজিয়াছে, বৃষকেতু সাজিয়াছে। কত পোশাক আর কত রংয়ের স্পর্শে সে কত ছদ্মবেশ ধরিয়াছে। কিন্তু অবশেষে আর ভালো লাগে না, অতএব সে একদিন পলাইল। দিল্লী, পাটনা, গয়া, কাশী, আরো কত জায়গায় সে কতরকমের কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখনও মিস্ত্রী, কখনও বিড়ি প্রস্তুতকারক, চা-বিক্রেতা, মাছ-বিক্রেতা, দোকানের মুহুরি, পাটের দালাল—এমনি নানা বেশে সে বছর সাতেক কাটাইল। কিন্তু সব মানুষের জীবনেই মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। রাখালের জীবনেও একদিন তাহা যখন আসিল তখন সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীত শিক্ষকতার কাজই আরম্ভ করিল। গলা তাহার মন্দ নয় তদুপরি সে মাহিনা কম লয় বলিয়া গোটা পাঁচেক মাস্টারি তাহার জুটিয়াছে। তাহাতেই চলিয়া যায়। দিলীপের সহিত তাহার আলাপ বছর দুয়েকের কিন্তু মানুষকে মুহূর্তে আপন করিয়া লইবার একটি ক্ষমতা রাখালের আছে। কিন্তু কে জানে, সে কতদিন এখানে থাকিবে। যেদিন আবার মনে ক্লান্তি আসিবে সেদিন হয়তো কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাতারাতি একদিন সে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বিচিত্র।

"বিড়ি খাবি নাকিরে?" রাখাল প্রশ্ন করিল।

"না।"

"এখনও পর্যন্ত বিড়ি খেতে শিখলি না হতভাগা—উচ্ছন্নে গেছিস তুই।" রাখাল হাসিল।

ঘরের ভিতরে অন্ধকারে কয়েকটা ইদুর চলাচল করিতেছে। অন্ধকারে কার মুখ? কে? কী বলছে?

"চা খাবি দিলীপ?"

"অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা খেতে পারি কিন্তু আগে তুই একটা আলো জ্বাল দেখি, এত অন্ধকার ভালো লাগছে না।"

"আমার কিন্তু অন্ধকারই ভালো লাগে। অন্ধকারে সব মিলিয়ে একাকার হয়ে যায়, নিজেকেও ভুলে যাই।"

"তুইও যে বড় বড় কথা বলতে আরম্ভ করলি রাখাল"—(কিন্তু কি করি? অসংখ্য ভাঙা কাঁচকে কি করে জোড়া দেওয়া যায়? সমস্ত পথকে একটা পথে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়?)

"বাঙালীর মাথা যে রে, বড কাজের চেয়ে বড় কথাই আমরা বেশি ভালোবাসি।"

রাখাল বাতি জ্বালাইল।

নিস্তব্ধতা।

স্টোভ জ্বালান হইল!

পূর্ব দিগন্তে মেঘগর্জন হয়। আজ আকাশে চাঁদ নাই।

নিস্তব্ধতা।

সময় কাটিতে লাগিল।

"নে—খা—"রাখাল চা দিল।

"একটা গান শেনোবি রাখাল?" (আমি কথা বলছি, না? আমি পাগল হই নি তো?)

"দূর—"

"না একটি শোনা।" (সব ভুলব?)

"কি গাইব?"

"যা ইচ্ছে—"

চা পান শেষ করিয়া রাখাল হারমোনিয়াম টানিয়া লইল।

গান আরম্ভ হইল। বেহাগ।

রাত্রি গভীরতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ক্লান্ত নটির নূপুরচিক্কনের মতো মহানগরীর দূরাগত অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যায়। পথিক, নিজের পদচিহ্নের দিকে চাহিয়ো না, ধূলার বুকে সে পদচিহ্ন কতক্ষণ থাকিবে?

দিলীপ শোনে। ঝড় উঠুক, ধুলা পড়ুক, শুকনো পাতা ঝরে পড়ুক। ভয় নাই, রাত্রির অন্ধকারে, মাটির গর্ভে সহস্র জীবনের অঙ্কুর পাখা মেলছে, মৃত্যুর সমাধি ফুড়ে আকাশের দিকে তাবা উঠছে। বুকের মধ্যে কি যেন তোলপাড় করছে। কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কাঁদব? কাঁদতে পারছি না। কে? কে আমার পাশে বসে আছে? ওঃ চোখের ভুল। দুঃখকে জয় করা যায় না? ধর্মং শরণং গচ্ছামি। কেন ভাবছি? কেন ভাবছ দিলীপ? সুস্থ হও, সাবধান হও। অতীত ও ভবিষ্যৎ মিথ্যা, মৃত্যু একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, পৃথিবীতে বড় আশা আর স্বপ্ন দেখে কেবলই দুঃখ। 'For in much wisdom is much grief : and he that increaseth knowledge increaseth sorrow' তাই হোক। সব ভুলি! অন্ধকার আসুক। আমি একটা নির্বাপিত দীপ; কিন্তু নির্বাণ কই? কিন্তু তাই কি? সুস্থ হওয়া মানেই কি সব কিছু গ্রহণ করা, অসুন্দরের দাসত্ব করা? না। সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দেব। (ঝড় কি উঠবে না?) অমৃতত্ব। 'ত্বমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ। আত্মানং ধারম্ অজরম্-যুবানম্।' 'ত্বং' কে? ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' তপন। আবার ভাবছি। না, ভুলব। যা মৃত তাই অতীত। ভবিষ্যৎ ও আশা মরী চকা। বর্তমানই সত্য। তাই গ্রহণ করব? আমি শিল্পী—সূর্যের তেজ, চন্দ্রের সুষমা, আকাশের ঘন-নীল উদারতা আমি আহরণ করে আনব, পথভ্রষ্ট মনুষ্যসমাজকে দান করব। ভাই মানুষ, থাম, আর এগিয়ো না। সামনে অতলস্পর্শী গহ্বরে ধ্বংস। কিন্তু মাথাটা আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা দোলক, আশা নিরাশার মাঝে দুল্‌ছি—দুল্‌ছি। কিছুই করতে পারছি না। কে ডাকে? আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি—

"রাখাল—"

রাখাল থামে না।

"ওরে ও রাখাল—থাম—"

রাখাল থামিল, "কি হল রে?"

"আমি যাই—"

"যাবি?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা।"

"দিলীপ"—রাখাল ডাকিল।

"কে?"

"আমি বোধ হয় কাল এখান থেকে চলে যাব—"

"চলে যাবি? কাল?" (যাযাবর পাখিকে দিগন্তের পৃথিবী ডাক দিয়েছে!)

"হ্যাঁ—"

"আবার কবে দেখা হবে?"

"বোধ হয় আর হবে না।"

"ওঃ—" দিলীপ হঠাৎ হাসিল। কেন সে তাহা জানে না।

রাখাল চুপ করিল। দিলীপ তাহার দিকে চাহিল। রাখালের ললাট রেখাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। যাযাবর রাখাল, তাহার দেহের বর্ণ না কালো না শ্যামবর্ণ। বহুদিন রৌদ্রে, জলে, ভিজিয়া পুড়িয়া কাঠের যে অবস্থা হয়, তাহার দেহের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে। মাথার চুলগুলি নিগ্রোদের মতো। কত গ্রামের কত লোকের বিস্মৃত স্মৃতির পরদায় তাহার কৃষ্ণ, তাহার শুকের ছবি আছে। সে যেন কি ভাবিতেছে। ঘরের আধময়লা হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোতে তাহার চিন্তামগ্ন মুখের একপার্শ্ব আলোকিত। বেঁহালার সুর মিলাইয়া গিয়াছে।

"চললাম রাখাল"—(পিছু তাকিয়ো না মন, কিছু ভেবো না, যে যায়, সে যাক্—)

আবার অন্ধকার গলি।

দিলীপ চলিতে থাকে। এবার কোথায় যাব? কি করব? কি করে মস্তিষ্কের দুঃসহ চিন্তাজাল থেকে নিষ্কৃতি পাব? সব ভেঙে গেছে, ভেঙে·

যাচ্ছে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত সমাজ। মনুষ্যত্বের অপমান তার পেশা। দেশ। আমাদের কি দেশ আছে? স্বাধীনতা। লৌহশৃঙ্খলের নিষ্পেষণে আমাদের বিবেক বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে, স্বাধীনতা কাকে বলা হয় তা আমরা জানি না। বন্দে মাতরম। বড়দা এখন কোন দেশে? সহস্র লোকেরা উন্মাদের মতো চিৎকার করে গেল। কিন্তু তারপর? আমার প্রতিগ্রাসে দশজন অভুক্তের ক্ষুধা। শঙ্করের উত্তেজিত চক্ষু দেখেছি, মেজদার স্বপ্নময় চাহনি দেখছি। সব মানুষ সমান হও। কিন্তু তারপর? যোগসূত্র কই? স্থৈর্য কই, ধৈর্য কই, ত্যাগ কই? মানুষের কাম্য কী? সুন্দর জীবন, শান্তি। সে কোথায়? কোন বিবাগী পাখির পক্ষপুটে তারা উড়ে গেছে গ্রহান্তরে। সৌন্দর্য নেই, শান্তি নেই, ভালোবাসা নেই। এক মানুষ আর এক মানুষের জীবনের আলো অপহরণ করে, মনের অন্ধকারে নিরন্তর সে ধারাল অস্ত্রে শান দেয় আর একজনের গলা কাটবে বলে। কার পাপ? এ আমার, এ তোমার পাপ। অন্যায় সহ্য করা, অবিচারকে মাথা পেতে নেওয়া, অত্যাচারকে স্বীকার করা, অসাম্যকে বরণ করাও পাপ, ঘোরতর পাপ! নিষ্করুণ বর্শা ফলকের মতো নিষ্ঠুর করে তোল ভাই মানুষ। আমি তোমার কাঁধে হাত রাখি, তুমি আমার কাঁধে হাত রাখ। হয় না—হবে না। ওরা ধ্বংস করবেই। উঃ, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। অন্ধকার। শঙ্কিতা, অবগুণ্ঠনবতী মহানগরীর অন্ধকার। আমার মনের ভিতরে অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকারে আমার দীন আত্মা একটি অতিক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে পাহারা দিচ্ছে। পথ দেখাও হে আমার অন্তরের প্রহরী, পৃথিবীর সব পথ আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কি ভাবছি! কি ভাবছি? ঝড় এল না? চতুরা মেঘমালার নয়নে কি জল নেই? ভয় লাগছে—আমার ভয় লাগছে—আমি কোথায় যাই? ভোল, সব ভোল। বিলাসের বিস্তৃত শয্যায়, আলস্যের মদিরায়, প্রেয়সীর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ কর। বিস্মৃতির কুয়াশায় তুমি পথ হারাও। তাই ভালো। বীণা। তুমি কি তাই চাও বীণা?

সন্তোষের বাড়ি।

"সন্তোষ"—দিলীপ ডাকিল।

কোনোও উত্তর আসিল না।

দিলীপ ভিতরে ঢুকিল। অন্ধকার। কেহ নাই।

একেবারে ভিতরে, কোণের ছোট ঘরটায় আলো জ্বলিতেছে। ঠাকুরঘর। সন্তোষের মা জপে বসিয়াছেন।

দিলীপ হাসিল। দেবতা? দেবতাদের জন্ম কোথায় হল?

সে ডাকিল—"সন্তোষ"—(আমি কেন এসেছি? ওঃ, আজ ভালো-বাসব। বীণা আমাকে ভালোবাসে। হাসি পায়।)

নিজের মনে দিলীপ হাসিল।

সন্তোষের মা তাহার ডাকে একটু নড়িয়া উঠিলেন।

উপব হইতে বীণা নামিয়া আসিল। দ্রুতপদে। পরিচিত কণ্ঠস্বরের স্পর্শে তাহার দেহ কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

সিঁড়িব নিচে নামিয়া সে থামিল। রাত প্রায় সাড়ে নয়টা। একলা ঘরে থাকিতে থাকিতে তাহার বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল—তাই চোখ দুইটি একটু স্তিমিত, খোঁপাটা খুলিয়া অজস্রতায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া সে দিলীপের দিকে চাহিল। দিলীপের চুলগুলি অবিন্যস্ত, রুক্ষ, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, রক্তের মতো লাল, পাঞ্জাবির বোতামগুলি খোলা। তাহাকে দেখিয়া বীণার হৃদয় আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। তবুও তাহারই সহিত আনন্দ-মিশ্রিত বিস্ময়ের জোয়ারে তাহার চেতনা প্লাবিত হইয়া উঠিল। বিস্ময় কেন? বিস্ময় নিজের প্রিয়তমকে দেখিয়া। যতবার সে দিলীপকে দেখে ততবার তাহার মন বিস্মিতকণ্ঠে বলে 'এত সুন্দর! আমার প্রিয়তম এত সুন্দর!'

দিলীপ বীণার দিকে অগ্রসর হইল, "সন্তোষ নেই বীণা?"

বীণা মাথা নাড়িল, "না, দাদা সেই যে সন্ধ্যের পর গেছে আর ফেরে নি।"

"ওঃ,"—(কি বলি? না—আমি ভুলতে চাই—)

"দাদার সঙ্গে দরকারী কথা আছে নাকি?"

"এঁ্যা? হ্যাঁ—আমি একটু বসব।"

"এস—ওপরে বসবে চল—"

বীণার পশ্চাতে পশ্চাতে দিলীপ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিল। সন্তোষের ঘরে গিয়া সে দাঁড়াইল।

"শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরেছিলে তো?" বীণা প্রশ্ন করিল।

"বাড়ি? হাঁ গিয়েছিলাম, কিন্তু কেন? (হে মোহিনী, ইন্দ্রজাল রচনা কর, আমার জ্ঞান অপহরণ কর, আমার দৃষ্টির সামনে রূপের কুহেলিকার জাল বোন—জাল বোন—)

বীণা হাসিল, "না, এমনি। তুমি যে রকম, হয়তো নাও গিয়ে থাকতে পার—"

"বীণা"—দিলীপ ডাকিল।

"কি?"

"তুমি আমার জন্য কেন এত ভাব?"

বীণা একটু হাসিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, পরে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "চা খাবে—আনব?"

দিলীপ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "কথা চাপা দিচ্ছ? আমি তাতে ভুলব না বীণা। বল, কেন তুমি আমার জন্য এত ভাব? কেন?"

বীণা স্থির দৃষ্টিতে দিলীপের রক্তারুণ দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইল, কিন্তু উত্তর দিল না।

"বলবে না? বলবে না?"

বীণার মুখে কথা ফুটিল, ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "শুনবে? নিতান্তই শুনবে? কিন্তু যা বলবার কোনোও মেয়ে তা প্রথমে বলে না।"

দিলীপ হাসিল, পরে গলার স্বর নামাইয়া বলিল—"না বললে, তবে আমিই বলি। তুমি আমায় ভালোবাস, না?"

বীণার সর্বাঙ্গ হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি এত রাতে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসেছ? আমি তো তোমার যোগ্য নই, আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে—"

দিলীপ হাসিল, পরে গলার স্বর নামাইয়া বলিল, না না, তা নয়, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বীণা (আমি পাগল হয়ে গেছি)—আজ বিকৃত মস্তিষ্কের জ্বালায় আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। নিছক বুদ্ধিবৃত্তিতে শান্তি পাচ্ছি না, তাই আমি ভুলতে চাই সব কিছু, এড়াতে চাই সব সমস্যা। নারীর ভালোবাসা তা পারে, তাই তোমার কাছে এসেছি। আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাস, আর তুমিও শুনে রাখ বীণা—আমিও তোমায় ভালোবাসি, হ্যাঁ ভালোবাসি বৈকি।"

বীণার সারা দেহ এবার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আশ্রয়চ্যুতা অসহায়া লতার মতো।

"বীণা আমার কাছে এস"—দিলীপ ডাকিল। সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, বিদেশ, মানুষ, সভ্যতা ভুলে গেছি—আজ রাত্রের রঙ্গমঞ্চে নারীর ভালোবাসায় সব রঙীন করে নেব—আহা, কত লোক মরছে। আমি একটা দোলক—আশা-নিরাশার মাঝে দুলছি—না, ভাবব না এসব কথা—

"বীণা"—

বীণা নড়িল না, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলও না।

দিলীপ তাহার নিকট আগাইয়া গিয়া দুই হাতে হঠাৎ বীণার মুখ তুলিয়া ধরিল। বীণা কাঁদিতেছে।

দিলীপ হাসিল, "তুমি কাঁদছ ? ইন্দ্রাণীর চোখের বিদ্যুৎ তবে মেঘবর্ষণে নিভে গেল ? না, চোখ মোছ, কেঁদো না, কেঁদো না লক্ষ্মীটি। মুছেচ ? বেশ এবার তবে—

'নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায় বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধরো'—

তুমি বড় সুন্দর বীণা। তোমার অশ্রু-ভরা চোখ, তোমরা কম্পিত অধর, তোমার মুখের লাবণ্য—এরা সব সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের আলো, ফুলের বর্ণ, পাখির গানের মতো—বড় সুন্দর। কিন্তু তুমি সুন্দর বলে, তোমায় ভালোবাসি বলেই তো আরো দুঃখ। পৃথিবীতে নারীর ভালোবাসা আছে,

পাখির গান আছে, চন্দ্র সূর্য আর নক্ষত্র আছে, অজস্র পুষ্পের সুরভিতে মন্থর বাতাস আছে—তবু—তবু কেন মানুষের স্বপ্ন বার বার ভেঙে যায়? কেন তারা ভালোবাসে না, সুন্দরের সাধনে কেন তারা উন্মত্ত তাপস হয় না? তুমি ভয় পেয়ো না"—

"শুনছ?" দিলীপের কাঁধে হাত দিয়া বীণা ঝাঁকুনী দিল। তাহার ভয় লাগে। দিলীপের চোখ বড় লাল, অনর্গল কি যে সে বলিয়া চলিয়াছে, বীণা তাহা ভালো বোঝে না। আবার সে কাঁদে। না কাঁদিয়া তাহার উপায় কি? সে ভালোবাসিয়াছে, সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া সে ভালোবাসিয়াছে। দিলীপের কি দুঃখ তাহা সে হয়তো খানিকটা বুঝিতে পারে, খানিকটা পারে না। কিন্তু আসল সত্যটা সে উপলব্ধি করে যে তাহার প্রিয়তমের হৃদয় গভীর দুঃখে বিকল হইয়া উঠিয়াছে। সে কাঁদিবে না কেন? সে নারী। সে সূর্যমুখী ফুল। তাহার তপস্যা শিবের জন্য। যে শিবের তপস্যা সুন্দরের জন্য।

মমতায় কণ্ঠ করুণ করিয়া, কাঁদিয়া বীণা বলিল, "তুমি এমন ক'চ্ছ কেন, কি হয়েছে তোমার?

"কি হয়েছে? কি করে বোঝাই? Oh what a piece of a work is man! বীণা, আমায় পথ দেখাও—

'মোর মাঝে কোন্ প্রাণ-মহানদ
ছুটিয়াছে অন্তহীন অসীমের লাগি,
তাহারে চিনাও!

বীণা, পৃথিবী কী ঘুরছে?"

বীণা অসহায়ের মতো চারিদিকে তাকায়। কী করিবে সে? পৃথিবী বিরাট, তাহাতে কত লোক, তাহাদের কত রকমের দুঃখ, সমস্যা, কত জটিলতার অন্ধকারে তাহাদের জীবন জর্জরিত। কিন্তু সে সাধারণ মেয়ে—পৃথিবীর সঙ্গে তাহার পরিচয় অতি অল্প দিনের—দিলীপের প্রশ্নের উত্তর সে কেমন করিয়া দিবে?

কোনও উত্তর নাই। তাই সে কেবল কাঁদে, অশ্রু-ধৌত ডাগর ডাগর চোখ মেলিয়া সে শুধু দিলীপকে শঙ্কিত-চিত্তে নিরীক্ষণ করে।

তবুও জোর করিয়া সে বলিল, "শোন—"

"ডাকছ? কি? কেন?"

"কেন পরের জন্য এত ভাবছ?"

দিলীপের মাথার চুলগুলি ধরিয়া টানিল, একটু হাসিল, পরে আবার পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল, "কেন ভাবছি? ভাবতে চাই না বীণা কিন্তু তবু উদ্ধত প্রেতের (তপন) মতো ভাবনাগুলি আসে—আমায় পাগল করে। তোমার ভালোবাসাও তা ভোলাতে পারে না। এই তো তুমি সামনে দাঁড়িয়ে—আমি কি তোমায় বুকে টেনে নিতে পারি না, আমি কি তোমায় চুম্বন করতে পারি না, আমি কি উপন্যাসের নায়কের মতো ছন্দোময় ভাষার গুঞ্জন তুলে তোমার দেহ আর আত্মার রূপবর্ণনা করতে পারি না? পারি—তবুও তা বলার প্রেরণা পাই না। কি হবে তা করে, তা বলে? আমি আর তুমি, আমাদের ভালোবাসা—সকলের ভিত্তি এই পৃথিবী, দেশ, সমাজ আর মানুষ। পতনশীল পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে কি করে আত্ম-প্রবঞ্চনা করি বীণা? এ যে পাপ—এ যে অপরাধ। বীণা, তুমি কাঁদছ কেন? আমার জন্য, না? হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি—কেঁদো না বীণা—এ যুগ ভালোবাসার যুগ নয়, বিলাসের যুগ নয়—এ কর্ম্মের যুগ—যুগযুগান্তের সঞ্চিতপাপ-স্খালনের যুগ। কেঁদো না—বীণা, জানালাটা খুলে দাও তো। খুলেছ? আঃ—অপূর্ব অন্ধকার রাত্রি।

'আবর্তে ঘুরিয়া মরে অন্ধ মোর বন্ধ প্রাণধারা,
বেদনায় সারা,
তাহাদের দেখাও পথ—
দ্বার খোল, দ্বার খোল রাত্রির প্রহরী।
শুনেছ কি, শুনেছ কি অন্ধকার রন্ধ্র করি,
আলোকের আর্তস্বরে, কাঁদে প্রতি তারকায়
কাঁদে সারা নিশি!
তারে মুক্তি দাও।"

বীণা হঠাৎ দিলীপের বুকে লুটাইয়া পড়িল, "তুমি থাম, ওগো তুমি থাম, তুমি কি আমাকে পাগল করতে চাও?"

দিলীপ বীণার মাথায় হাত বুলায়, "এঁ্যা, তুমিও পাগল হয়ে যাচ্ছ? না—তবে আর কিছু বলব না। তবে এইবার যাই, কেমন? ভালোবাসার অনেক কথাই তো বললাম, আর কেন?"

বীণা চোখ মুছিয়া প্রশ্ন করিল, "দাদার সঙ্গে দেখা করবে না?"

"দাদা! ওঃ, সন্তোষ? না, তার সঙ্গে দেখা করব না, আর তার সঙ্গে দেখা করতে তো আসি নি—এসেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। না, আমি যাই—"

"আর একটু বসবে না?"

"হে মোহিনী আর কেন? এবার তোমার ইন্দ্রজালকে অপসারণ কর—আমায় মুক্তি দাও—"

দিলীপ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। তারপর পা টলিতেছে। বীণা পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসে।

"তুমি টলছ! তোমার শরীর খারাপ, তোমায় ধরব?"

"উন্মাদিনী—তুমি কোন তারকালোকে থাক? তোমার কি চক্ষু-লজ্জা নেই?"

"না—আমার আর লজ্জা নেই, ভয় নেই।" শান্তকণ্ঠে বীণা বলিল।

"তাই নাকি?—ওঃ, তবে আমিই সেই লজ্জাহারী, ভয়হারী মধুসূদন! শিবোহং হুঁ, There's a divinity that shapes our ends."—

সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিয়া দিলীপ একবার ঠাকুরঘরের দিকে তাকাইয়া কি বলিতে গেল, বীণা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কথা বলিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া সে তাহাকে বাহিরের ঘরে লইয়া গেল।

দিলীপ পথে নামিল। বীণাও সঙ্গে সঙ্গে নামে।

"তুমি কেন আসছ, কোথায় আসছ?"

"তোমায় এগিয়ে দি—

"সাবধান, একপাও এগিয়ো না বীণা। তোমরা গৃহ-দ্বারের বাইরের এ জগৎ আলাদা—এখানে সমাজ থাকে, তার অজস্র মদমত্ত চক্ষু কেবল কদর্যতা খোঁজে। সে দৃষ্টিতে তুমি পড়ো না—যাও, ফিরে যাও বীণা।"

বীণা থামিল।

ব্যাকুলকণ্ঠে সে বলিল, রাস্তাঘাট দেখে-শুনে যেও, বুঝলে?

"রাস্তা! আচ্ছা—খুঁজব—খুঁজব—" (কিন্তু রাস্তা কই?)

"সোজা বাড়ি গিয়ে ঘুমোবে, কেমন?"

"আচ্ছা—আচ্ছা হে মর্তের প্রেয়সী—এবার চললাম—"

দিলীপ চলিতে লাগিল। সে গলি অতিক্রম করিয়া অন্য রাস্তায় পা দিল। সে একবারও পিছনের দিকে চাহিল না। যদি চাহিত তবে হয়তো দেখিত যে বিস্রস্তবসনা, আলুলায়িত-কুন্তলা বীণা তাহার দুই স্থির চোখের বহ্নি দিয়া, অন্ধকারকে পুড়াইয়া দিয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া আছে।

দিলীপের শরীর অবসন্ন। মনে হয় যেন জ্বর আসিয়াছে। শরীর টলে। যেন মাতাল।

সে হাসে। ভালোবাসা। মিষ্টি কথা আর চোখের জল। বড় অশোভন। অগ্নিদগ্ধ রোমের প্রাসাদে নীরোর বেহালা বাজানোর মতো রূঢ়। কিন্তু তবুও তা মিষ্টি, মনকে একটু ভোলায়। হায়, পৃথিবীতে সৌন্দর্য এখনও আছে—এখনও ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন হয় নি, এখনও ফুল ফোটে। অথচ মানুষ মরছে—মরছে—হিংস্র লালসার নখরাঘাতে পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। আকাশে আজ তারা নেই। আকাশপথ বেয়ে শকুনিরা উড়ছে! অগ্নিবৃষ্টি। লুকোও মাটির গহ্বরে, অন্ধকারে নিজেকে চাপা দাও। আলো নিভিয়ে দাও—কালো রংয়ের প্রলেপ লাগিয়ে সব কুৎসিত করে দাও। বোমা ফাটছে—আহা, শূন্যে ও কার হাত, ও কার মুণ্ড, ও কার চক্ষু ও কার হৃৎপিণ্ড! দুর্গন্ধ। গলিত নাড়িভুঁড়ি, প্লীহা, ফুসফুস, এই দেহ। The way of all flesh. But is this the way? পোকাগুলি কিলবিল করছে। তাদের উপর দিয়ে চতুষ্পদ হয়ে চল। নরমাংস ভোজন কর। কেমন লাগে? বিষবাষ্প? পুতুলের মতো মানুষগুলি পড়ছে। ও কার দীর্ঘনিশ্বাস? না কিছু না, বাতাস বইছে। ও কার চোখ? না, কিছু না, মোটরের হেড্‌লাইট। সমুদ্র আলোড়িত, বায়ুস্তর ক্ষুব্ধ, মৃত্তিকা বিদীর্ণ। যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—। লুকোও—লুকোও—সাইরেন

আর্তনাদ করছে (ও গোপবালকের বাঁশি নয়)—নিজের অন্তরের দীপ-শিখাকে আঁচল দিয়ে ঢাক—ঝড় এল। আকাশটা কাঁপছে—মাটিটা দুলছে—আমি একটা দোলক—দুলছি, দুলছি—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—না—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক—শূন্য—অনন্ত শূন্যে আমি পথ হারিয়েছি—গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ লেগেছে—ভাই মানুষ—হুঁসিয়ার—কে ?

"শোন"—একজন লোক ডাকিল।

দিলীপ শুনিল না। সে চলিয়া গেল।

লোকটি হাসিল, নিজের মনে বলিল, "আমায় চেনে নি।"

সে চারিদিকে চাহিল, পরে আবার চলিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিতে সন্দেহ ও সতর্কতা।

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সে থামিল, ঘুরিয়া পিছন দিকে চাহিল।

দূরে একজন কোট-পরিহিত বছর ত্রিশের লোকও তাহাকে থামিতে দেখিয়া থামিল।

প্রথম লোকটির চেহারা অদ্ভুত। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়ন, পরিশ্রান্ত মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি, গায়ে এণ্ডির চাদর, পায়ে ক্যাম্বিসের ময়লা জুতা। বয়স তাহারও ত্রিশের উপর।

হঠাৎ কি ভাবিয়া লইয়া সে নিকটবর্তী একটি গলিতে দ্রুতপদে ঢুকিল। গলিটি খানিক দূর গিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া দক্ষিণে ও বামে চলিয়া গিয়াছে। সে বাম দিকেরটিতে প্রবেশ করিল। সেই গলিতে নিম্নস্তরের বেশ্যারা থাকে।

একটি বাড়ির দরজায় একটি বছর পঁচিশের কালো ও মোটা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল।

লোকটি বলিল—"ভেতরে আসব ?"

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "তা আবার জিজ্ঞেস কচ্ছেন ? আসুন"—

সে নিজের বিশৃঙ্খল ও স্যাঁৎসেঁতে ঘরে লোকটিকে লইয়া গেল।

"বসুন"—

"শোন—একটি কথা আছে।"

"বলুন।"

"আমি এখানে কিছুক্ষণ বসব ?"

"কি যে বলেন, নিশ্চয়ই বসবেন। দুটাকা লাগবে।"

লোকটি দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিল।

স্ত্রীলোকটি তাহা বাজাইয়া পরখ করিয়া লইল। পরে লোকটির দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, "আমায় মাপ কর, আমি ওজন্যে আসি নি, আমি এখানে খানিকক্ষণ লুকিয়ে থাকতে চাই।"

"কেন ?" স্ত্রীলোকটি ভয় পাইল।

"আমি একজন বিপ্লবী—আমায় পুলিশ বছর কয়েক ধরে খুঁজছে—এখন একজন পেছুও নিয়েছে—তাই।"

স্ত্রীলোকটি ভাবিতে লাগিল।

"কি ভাবছ ?" লোকটি প্রশ্ন করিল।

বহির্দ্বারে করাঘাত হইল।

লোকটি চুপ করিল, তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকটি লোকটির মুখের দিকে চাহিল!

"কইগো—কেউ নেই নাকি ?" কে যেন ডাকিল।

পাশের একটি বাড়ি হইতে হারমোনিয়ামের বেতালা বাজনার সহিত কোনও বেশ্যার নূপুরের ধ্বনি আর তাহার নাগরদের মত্তকোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

আপনি ঐ আলমারির আড়ালে যান"—

লোকটি তাহাই করিল।

স্ত্রীলোকটি দরজা খুলিল, কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল—"কে গো—তুমি কে ?"

সেই কোট-পরিহিত লোকটিকে দেখা গেল। সে ঘরের ভিতরে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, "টাকা চাও ?"

স্ত্রীলোকটি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, "দাওনা ঠাকুর"—

লোকটি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—"কিন্তু এমনি না"—

"তবে ?"

"একজনের মাথার দাম—হাজার টাকা, বুঝেছ?"

স্ত্রীলোকটি খিলখিল করিয়া হাসিল—"ছাই বুঝেছি, এস, ভেতরে এস—না না, ইয়ার্কি নয়"—

লোকটি বলিয়া চলিল, "তুমি সেই হাজার টাকা পেতে পার। কোনও দাড়ি-ওয়ালা লোক তোমার এখানে এসেছিল, অ্যাঁ?"

"দাড়ি! ও বাবা—না, মাইরি না। দাড়িতে আমার বড় সুড়সুড়ি লাগে"—

কোট-পরিহিত লোকটি স্ত্রীলোকটিকে ঘৃণাভরে ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

আলমারির পশ্চাৎ হইতে লোকটি বলিল, "দেখ তো ও কোনদিকে যায়!"

স্ত্রীলোকটি বাহিরে গেল। দুই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ডানদিকে গেল।"

লোকটি বাহির হইয়া আসিল, গভীর কৃতজ্ঞতায় ভাঙিয়া পড়িয়া সে বলিল, "তুমি আজ আমায় বাঁচিয়েছে। হাজার টাকার লোভ বড় সহজ নয়, কি করে তা তুমি দমন করলে?"

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "আমিও দেশকে ভালোবাসি মশায়।"

লোকটি বলিল—"তোমার কথা আমার মনে থাকবে, আমি অকৃতজ্ঞ নই।"

সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

স্ত্রীলোকটি ডাকিল—"শুনুন—"

লোকটি দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটি বলিল, "যার মাথার দাম হাজার টাকা, তার দেশভক্তিকে একটা পেন্নাম করা উচিত।"

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গলায় আঁচল দিয়া সে লোকটিকে প্রণাম করিল। পরে আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া লোকটির পকেটে রাখিয়া বলিল—"আপনার কাজে লাগবে—নিয়ে যান।"

লোকটির চোখে জল আসিল, ক্ষণকাল পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম?"

"কেষ্ট—কেষ্টলতা—"

লোকটি তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "বোন, মায়ের দুঃখ যেদিন দূর করতে পারব সেদিন তাঁকে আরতি করার পঞ্চপ্রদীপ তুমিও পাবে।"

"মা—কে আপনার মা ?"

"ভারতবর্ষ।"

লোকটি দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল।

দ্বারপ্রান্তে কেষ্টলতা দাঁড়াইয়া তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

লোকটি বামদিকের গলি ধরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

গলির শেষে উপনীত হইয়া সে একটি রিক্‌সা ডাকিল।

"শ্যামবাজার চল ভাই—"

"জী"

রিক্‌সা চলিল। ব্ল্যাক-আউট। আব্‌ছা আলোর নিচে জনতা। সব অপরিচিত মনে হয়।

সেই লোকটি বসিয়া বসিয়া ভাবে। কতদিন—কতদিন পরে ফিরে এলাম ! এই আমার জন্মভূমি (মা, তোমায় কতদিন দেখি নি)—এই আমার দেশ। ভারতবর্ষ। বন্দে মাতরম্‌। উত্তরে, পশ্চিমে আর পূর্বে হিন্দুকুশ আর হিমালয়ের প্রাচীরে দেবতারা রক্ষী। সেখান থেকে হাঁটতে আরম্ভ কর। কতবার সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হবে। কি বিরাট এই দেশ ! কি অপূর্ব ! কত নদনদীর প্রাণরসে স্নিগ্ধ তার দেহ। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং মাতরম্‌। কোথাও মায়ের শ্যামশ্রী, কোথাও তাঁর ধূসর রুক্ষতা, কোথাও গৈরিক বৈরাগ্য। তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। মা আমার অন্নপূর্ণা। প্রান্তরে তাঁর শস্যের সঙ্গীত। আমার দেহ ভারতবর্ষের মাটি। আমার রক্ত, অস্থি, মেদ মজ্জা তাঁর জল আর ফলের পরিণতি। আমার বুদ্ধি আর আত্মা তার মহতী আত্মার এক ভগ্নাংশ। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। বন্দে মাতরম্‌। হাঁট। অনেক সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের পরে যখন তুমি দক্ষিণে পৌঁছুবে তখন শুনবে অনন্ত নীলাম্বুর তরঙ্গে মায়ের স্তুতিগান। সেও মায়ের প্রহরী। তবু কি হল ? পর্বত অতিক্রম করে, সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে পরস্বাপহারী দস্যুরা এল। মায়ের চরণে পুষ্পমালা

দিতে এসে লৌহশৃঙ্খলে মায়ের রক্তচরণ দুটিকে তারা শৃঙ্খলিত করল। মায়ের সরল সন্তানেরা তা বুঝল না—যখন বুঝল তখন তারাও শৃঙ্খলিত—তাতে কি? শৃঙ্খল তবুও ভাঙবে—আর কেঁদো না মা। আমাদের জন্ম দিয়েছ তুমি—তোমার বন্দীত্ব আমরা মোচন করব। আমি? আমি না পারলেই কি, তবু আমার এই কর্ম, আমার এই সাধনা, এই আমার ধর্ম। 'অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ স্বধর্মংকীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।' আমার জন্ম মায়ের মুক্তির জন্য। সে কর্ম থেকে বিরত হব? বারবার মরব—বারবার জন্মাব—ভয় নেই। হায় মা, তুমি অন্নপূর্ণা। অথচ তোমার সন্তানদের মুখে অন্ন নেই। তুমি দেবতাদের ধনভাণ্ডার অথচ তোমার সন্তানেরা নগ্ন। তোমার অন্ন, তোমার রত্নৈশ্বর্য অসুরেরা লুণ্ঠন করে নিয়ে উৎসব করছে। তবুও বলছি মা, ভয় নেই, আবার তুমি আশীর্বাদ কর। শত শত বৎসরের অগণিত অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা আমাদের বাহুপেশীকে লৌহ করে তুলেছে, আমাদের হৃদয় আর মনকে প্রস্তরে পরিণত করেছে। আরো অত্যাচার ওরা করুক, আরো পদাঘাতে আমাদের মর্মকোষে ওরা ক্রোধ প্রজ্বলিত করুক—তাতে ভয় নেই। ওদের অপমানই তো আমাদের অস্ত্র। দিন ঘনিয়ে এসেছে মা—তোমার ক্রন্দনে ক্ষুব্ধ দেবতাদের রোষ আমাদের সহায়। আমরা—তোমার কোটি কোটি সন্তানেরা—একদিন বেরোব, তোমার শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিকে দিকে তোমার জয়-পতাকা নিয়ে অগ্রসর হব। অসুরের রাজত্ব আর যন্ত্রের যুগ এবার শেষ হবে মা—তোমার অভিশাপ-বহ্নিতে ওদের চিতাগ্নিশিখা লকলক করছে—ওদের অনাচার, অবিচার, অন্যায়, অধর্ম, অমানুষিকতা আর জালিয়াতির জতুগৃহে আগুন লেগেছে। এবার আমরা একযোগে বেরোব—দূর পশ্চিম থেকে পূর্ব ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যত সন্তান আছি—সবাই বেরোব—সবাই বেরোব আমাদের জন্মগত অধিকারকে ফিরে পেতে। আর আমরা কাপুরুষ নই, আমরা এবার বুঝতে পেরেছি যে আমরা মানুষ—আকাশের আলো আর বাতাস, স্থল আর জলের মতো স্বাধীনতা আমাদের চাই। মা, তুমি আমাদের শক্তি দাও, আমাদের শক্তি দাও—

"শ্যামবাজার আ গিয়া বাবু—"

"আচ্ছা ভাই—এই নাও তোমার পয়সা—"

অন্ধকার। শত্রুভয়ে ভীত মহানগরীর অস্পষ্ট অবয়ব। রাস্তার লোকজনের ভিড়ও এখন একটু কমিয়াছে। রাত্রির যৌবন-স্রোত ক্ষুরধার-বেগে বহিয়া চলিয়াছে।

একটি গলির মুখে লোকটি থামিল। বার কয়েক নিজের পশ্চাত ও সম্মুখদিক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সে নিজের মনে মাথা নাড়িল। ঠিক এই গলি বটে।

সে গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

অন্ধকারে কয়েকটি বাড়িতে প্রবেশ করিতে গিয়া সে আবার থামিল। তাহার ভুল হইয়াছে।

অবশেষে একটি দ্বিতল বাড়ির দরজার সম্মুখে গিয়া সে দাঁড়াইল। হ্যাঁ, এই বাড়িই বটে। ঐ তো দেওয়ালের গায়ে পাড়ার একটি নাবালক শিল্পীর আঁকা সেই পুরাতন হাতির ছবি। লোকটির মুখে হাসির চিহ্ন দেখা গেল।

দরজায় সে করাঘাত করিল।

এবারও উত্তর নাই।

আবার।

"কে ?" ভিতর হইতে সাড়া আসিল। যে সাড়া দিল সে যেন সন্দিগ্ধ-মনে, ঈষৎ শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল।

লোকটি সেই শব্দে আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "আমি।"

"আমি কে ?"

"পলাতক।"

দরজা খুলিল, ধীরে ধীরে হ্যারিকেন হস্তে একটি উন্নতনাসা, কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ লোককে দেখা গেল। সে খদ্দর-পরিহিত।

"কে—কে আপনি ?" হ্যারিকেনটি তুলিয়া ধরিয়া বলিষ্ঠ লোকটি সন্দেহ-মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

লোকটি বলিল—"মায়ের দুঃখ কবে দূর হবে বিষ্ণু ?"

বলিষ্ঠ লোকটির নাম বিষ্ণু। লোকটির কথা শুনিয়া মুহূর্তে তাহার অতীতের কতকগুলি কথা মনে পড়িল। অন্ধকার রাত। নিস্তব্ধ পথ। বিনিদ্র রাত্রি। উলঙ্গিনী শ্যামার করালমূর্তির পদতলে প্রতিজ্ঞা। করালীকে অন্নপূর্ণা করার প্রতিজ্ঞা।

বিষ্ণু একপদ অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কে প্রমথ?"

লোকটি হাসিল, মাথা নাড়িল। হ্যাঁ, সে প্রমথ।

প্রমথ বলিল, হ্যাঁ,—আমি প্রমথ, তবে অনেক বদলেছি।"

বিষ্ণু ভালোভাবে প্রমথকে নিরীক্ষণ করিল। হ্যাঁ, প্রমথর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধুদের মতো বড় বড় চুল আর দাড়ি, বসন্তের কয়েকটি চিহ্ন, রৌদ্রদগ্ধ, অমসৃণ মুখমণ্ডলে অসংখ্য চিন্তার চিহ্ন। মনে পড়ে ......এগিয়ে চল..... সেই নবীন যৌবনের প্রথম প্রভাতে রক্তের স্বপ্ন...... অন্ধের মতো—উদ্ধত বালকের মতো যুক্তিহীন......কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন..... কারাগার......দ্বীপান্তর......হায়—

কে যেন গলি দিয়া আসিতেছে। তাহার পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয়।

"ভেতরে এস প্রমথ"—বিষ্ণু আহ্বান করিল।

"হ্যাঁ।"

ঘরের ভেতর সবই বিশৃঙ্খল। ইতস্তত সাময়িক পত্রিকা আর পুস্তকাদি পড়িয়া আছে। দেখিয়াই মনে হয় যে এই ঘরের বাসিন্দা নেহাত রাত্রি-যাপনের জন্যই এখানে থাকে।

প্রমথ প্রশ্ন করিল, "বাড়িতে একা থাক নাকি বিষ্ণু?"

"না; দাদা, বৌদি আর তাঁদের দুটি ছেলেমেয়েও আছে।"

"কি করেন তিনি?"

"দোকান—সেই চালডালের দোকান।"

"হুঁ—তাহলে তুমি সংসার বসাও নি?"

"অর্থাৎ বিয়ে?"

"হুঁ—"

"না। কি হবে কতকগুলো দাসদাসীর জনক হয়ে?"

প্রমথ চুপ করিয়া রহিল।

"তারপর? এতদিন ছিলে কোথায়?" বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিল।

"মালয়।"

"সে কি, ধরা পড়লে না!"

"সেটা সত্যি আশ্চর্য—"

"কবে ওখান থেকে বেরিয়েছ—কোনদিক দিয়ে এলে?"

"যুদ্ধ আরম্ভ হলে মালয় থেকে শ্যামে পাড়ি দিয়েছিলাম—সেখান থেকে উত্তর ব্রহ্ম হয়ে এখানে এসেছি। সে অনেক কথা—আর একদিন বলব।"

"তোমায় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, এখানে কবে এসেছ?"

"আজ সন্ধ্যেবেলা।"

"আজ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

"খেয়েছি। একটা হোটেলে। সেখান থেকে একটা লোক পিছু নিয়েছিল।"

বিষ্ণু মাথা নাড়িল, "লাগবেই। তোমার শাস্তি পাওনা আছে। আমরা আমাদের ঋণ সুদে আসলে চুকিয়েছি—তোমারটা শোধ হয় নি।"

প্রথম মাথা নাড়িল।

বিষ্ণু ভাবিয়া বলিল, "আমার মনে হয় তোমার আজকালকার দিনে এখানে না এলেই ভালো হত।"

"কেন?"

"ধরা পড়ে লাভ কি?"

"লাভ আছে। আগে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা পিস্তল কিম্বা বোমা হাতে নিয়ে দেশ উদ্ধার করার স্বপ্ন দেখতাম। আজকাল স্বপ্নে কষ্ট বোধ হয়। আগেকার দিনে সব্যসাচীর মতো সব কিছু এড়িয়ে যাওয়াটাই লক্ষ্য ছিল। আজকাল তা নয়। সব্যসাচী হওয়ায় কোনো ক্রেডিট্‌ই নেই বিষ্ণু —ও একটা রোম্যান্টিক স্টেজ—যখন কল্পনা কর্মকে আচ্ছন্ন করে। তাছাড়া, বিদেশ থেকে দেশের শুভ চিন্তা যতই করা যাক না কেন, দেশের উপকার কিংবা অপকার কোনোটাই করা যায় না।"

বিষ্ণু নিঃশব্দে মাথা নাড়িল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দতা বজায় রহিল।

প্রমথ কথা বলিল, "আজকাল কি করছ, বিষ্ণু?"

বিষ্ণু হাসিল, "দেশকে ভালোবেসে অন্য কিছু করার যোগ্যতা আমরা হারিয়েছি। যোগ্যতা থাকলেও ভয়ে কেউ ঠাঁই দেয় না। অতএব এক সংবাদ-পত্র অফিসে যৎকিঞ্চিৎ লিখে গ্রাসাচ্ছাদন করি আর দিবারাত্র কল্পনার রথে উধাও হয়ে স্বাধীন ভারতে ঘুরে বেড়াই।"

"না, আমি তা বলছি না।"

"তবে?"

"দেশসেবা কোন মতানুযায়ী করছ?"

"একেবারে অহিংসপন্থী।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ প্রমথ, আমাদের সে দিনগুলো একটা রোম্যান্টিক ভাবের ইতিহাস! সত্যকে উপলব্ধি করেছি আমি, আমাদের হিংসার পথ রুদ্ধ।"

"ঠিক।"

বিষ্ণু প্রমথর দিকে চাহিল, "মানে, তুমি সায় দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তুমিও বদলেছ।"

"পৃথিবীর সবই পরিবর্তনশীল।"

"তোমার কি মত?"

"আমাকেও অহিংসাবাদী হতে হবে। সেই জন্যেই আমি ফিরে এসেছি।"

"কি করবে তুমি?"

"কংগ্রেসে ঢুকব।"

"কেন?"

"যেহেতু কংগ্রেসই দেশের প্রতীক। আগে একা কিংবা চার পাঁচ জনেই

যুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখতাম, আজকাল কোটী কোটী লোক একসঙ্গে যুদ্ধ করার কথা ভাবি এবং তাই হবে।"

"শুধু এই?"

"তাছাড়া—আমাদের মন দুর্বল। বিদেশী শাসনের সবচেয়ে বড় পরিণাম—আমাদের বিবেক-লোপ। সেই বিবেক নেই বলেই সশস্ত্র যুদ্ধ তো দূরের কথা অহিংস যুদ্ধও সম্ভব হচ্ছে না। সেই যুদ্ধ সম্ভব করার জন্য আমি চেষ্টা করব। না পারি তবু আক্ষেপ নেই—কিন্তু দেশের কাজ আমাকে করতে হবে।"

বিষ্ণু বলিল, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন প্রয়োজনের খাতিরে অহিংস হয়েছ প্রমথ। তোমায় তো আমি চিনি।"

প্রমথ মৃদু হাসিল, "ঠিকই বলেছ। প্রয়োজনের খাতিরেই তো ঢুকেছি।"

"কিন্তু"—

"তোমার আপত্তি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার লক্ষ্য কি সেটা ভাব—তাতে তোমায় আমায় প্রভেদ কোথায়? তোমাদের ঐটিই দোষ বিষ্ণু—মতবাদকেই তোমরা মুখ্য করে তুলতে চাও। ওটা ভালো লক্ষণ না, ওতে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে—খানিকটা এর মধ্যে হয়েছেও। আমি, তুমি—একা—একান্ত অসহায়। অগণন জনগণের বাহু ও প্রাণের সাহায্যেই স্বাধীনতা আসবে। সেই জনশক্তি যদি অহিংসাবাদ পরিত্যাগ করে অন্য পথে যায়—তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। স্বাধীনতা তো একদিনে আসে না—অনেক ভুল, অনেক অগ্নিপরীক্ষার পরে তা লাভ হয়। অতএব দুঃখ কেন?"

"তুমি অহিংসাবাদ কতদূর মান?"

"যতদূর আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়। তোমাদের কাছে অহিংসা ধর্ম, আমার কাছে তা উপায়—নিরুপায়ের উপায়, আমার কাছে তা অস্ত্র। তবু বলছি—রক্তপাত হবেই।"

"কাদের?"

"আমাদের।"

বিষ্ণু চমকিয়া উঠিল, "কেন ?"

"শত শত বৎসর পরাধীনতা সহ্য করা, মনুষ্যত্বকে তিলে তিলে হারিয়ে বেঁচে থাকা ঘোর অপরাধ—তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের রক্ত দিয়েই করতে হবে। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ—মায়ের অভিশাপ।"

বিষ্ণু সায় দিল, "হ্যাঁ। আজ থেকে নিউ মুভমেণ্ট আরম্ভ হল—কে জানে কি হবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল ল, "এবার রক্ত পড়বে—সে রক্তে স্বাধীনতার বীজ-বপন হবে।"

বিষ্ণুর সমস্ত দেহ শিহরিত হইয়া উঠিল।

"রক্ত! রক্ত পড়বেই। ইতিহাসকে অগ্রাহ্য কবো না বিষ্ণু, স্বাধীনতাব ইতিহাস রক্তাক্ত। স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষণ দুয়ের জন্যই বক্ত দিতে হয়। স্বাধীনতা একটা অধিকাব—তা আদায় করে নিতে হয়—ভিক্ষায় তা পাওয়া যায় না। সারা পৃথিবী অহিংস না হওয়া পর্যন্ত তোমার অহিংসা নিরর্থক। তাই বলছি—অহিংসাবাদ ভালো কিন্তু তা যেন স্বাধীনতাকে গৌণ না করে। যে আত্মার বিকাশের জন্য অহিংসাব্রত পালন করা উচিত সেই আত্মা কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। সত্যি, এবারকার মুভমেণ্ট কি হবে কে জানে—"

"কেন ?"

"সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া মানে মৃত্যুবরণ করা—এমন দুর্জয় সাহস কজনেব আছে ? দেশের লোকেরা ভয়ে অহিংস হয়েছে, আত্ম-প্রত্যয়ের ফলে নয়—তার মানেই যে অধিকাংশের কাছে অহিংসা একটা উপায়···নিরস্ত্রের অস্ত্র। এবার তার পরীক্ষা হবে—"

"তারপর—?"

"জনসাধারণ যদি সত্যই অহিংস হয় তবে অসংখ্যের রক্তস্রোতে স্বাধীনতা আসবে। যদি না আসে তবে ব্যর্থ পৌরুষের প্রকাশ হবে অস্ত্রের আকারে—তাতেও রক্তপাত। রক্ত আমাদের ঢালতেই হবে।"

"আমি তা বিশ্বাস করি না—(কিন্তু তবুও একি আশ্চর্য মন আমার!)"

"না করলে—কিন্তু এই হবে। জনশক্তি একটা পথ বেছে নেবেই। যে পথই হোক—যেটা সকলেব পথ, এবার থেকে আমরাও সেই পথ।"

প্রমথ চুপ করিল।

বিষ্ণু ভাবে। বন্দেমাতরম্। মহাত্মা গান্ধীর জয়। স্বাধীনতা চাই। আমার হাতে অস্ত্র নেই, আমি ন্যায় ও সত্যের সেবক। তবু কেন রক্ত পড়বেই? ওঃ ঠিকই তো। যে অন্যায় করে সে তো ন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করবেই। যে সত্যকে মানে না সে তো তার কণ্ঠরোধ করবেই। রক্ত পড়বেই।

সে প্রমথর দিকে চাহিল। প্রমথর দৃষ্টি দেওয়ালের উপর নিবদ্ধ। তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল, ললাট কুঞ্চিত। দেওয়ালের উপর তাহাদের উভয়ের ছায়া।

দরজার উপব কে যেন বাহির হইতে করাঘাত করিল।

প্রমথ চমকিয়া উঠিল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে বিষ্ণু?"

আবার করাঘাত

"কে?" বিষ্ণু সাড়া দিল।

"আমি শঙ্কর।" বাহির হইতে উত্তর আসিল।

প্রমথ বিষ্ণুর মুখের দিকে চাহিল।

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল, "শঙ্করকে মনে নেই—সেই লেবার পার্টির? আজকাল সে পার্টির সম্পাদক।"

প্রমথ ক্ষণকাল ভাবিল, পরে মাথা নাড়িল, "মনে পড়েছে—আমাদের শঙ্কর—ওয়াটসন্ সাহেবের মাথা যে ভেঙেছিল"—

"হ্যাঁ"

"বিষ্ণু"—শঙ্করের ডাক।

"খুলছি।"

দরজা খুলিলে শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। বিষ্ণুর দিক হইতে যখন তাহার দৃষ্টি প্রমথর উপর পড়িল তখন তাহার চোখে কৌতুহল পরিস্ফুট হইল।

বিষ্ণু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "একে চেন শঙ্কর ?"

শঙ্কর মাথা নাড়িল—"কৈ—না—মনে পড়ছে না।"

"ও আমাদের প্রমথ।"

শঙ্করের চোখের কৌতূহল বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইল।

"কোন প্রমথ ? শেখরের দাদা—আমাদের প্রমথ ?"

"হ্যাঁ—"

প্রমথ মাথা নাড়িল, দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া সে ডাকিল, "হ্যাঁ—আমি প্রমথ, মরি নি, বেঁচে আছি।"

শঙ্কর প্রমথকে আলিঙ্গন করিল।

তারপর বসিতে বসিতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "কবে এলে ?"

"আজ।"

"কেউ লেগেছে কিনা ?"

"হ্যাঁ"—

"বড় দুঃসময়ে ফিরে এলে প্রমথ।"

"দুঃসময় বলেই তো এলাম"—

"ভালো। তোমার কাহিনী পরে একদিন শুনব! আজ তুমিও ক্লান্ত, আমারও অনেক কাজ আছে। তাহলে এবার কাজে নামবে ?"

"হ্যাঁ।"

"এবার কোন পথ ?"

"এবার জনতার পথ।"

"ভালো। আমাদের উৎসাহ বাড়বে। কিন্তু কদিনই বা"—(লৌহ-প্রাচীরের আহ্বান শোন নি ?)

"তাতে ভয় কি—পায়ের নীচে দেশের মাটিই তো থাকবে।"

"হ্যাঁ।"

নিঃশব্দতা।

সকলের মস্তিষ্কের সম্মিলিত ঐকতান। দীর্ঘদিনের অনাহার, অনিদ্রা, দুর্গম পথের ভয়, উৎকণ্ঠা, দুঃখ, কষ্ট আমাকে আমার দেশকে আরও

'ভালোবাসতে শিখিয়েছে। যে কোনো উপায়ে হোক স্বাধীনতা চাই। আমাদের দেহ দুর্বল, আমরা নিরস্ত্র কিন্তু আমাদের আত্মার শক্তি দুর্জয়, ক্ষুরধার তার দীপ্তি—আমাদের জয় হবেই। আমাদের জয় হবেই—এ দেশ আমাদের—উপরের আকাশ আমাদের—আমরা সব ভাঙব। সাবধান হে শোষকশ্রেণী—আমাদের অস্ত্র হয়েছে, আমরা বিবেক ফিরে পেয়েছি, আমরা জেনেছি যে সব মানুষের সমান অধিকার। সাবধান। মহাকালের পদক্ষেপের তালে তালে তোমাদের প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে—আমাদের ভগ্নস্তূপের মাঝেই আমাদের নতুন প্রাসাদ গড়ে উঠছে। সাবধান হে শবলুব্ধ নভোচারী—মহেন্দ্রের বজ্রাগ্নিতে তোমার লোভের বিস্তৃতপক্ষ ভস্ম হবে—ভস্ম হবে—

"শঙ্কর"—বিষ্ণু ডাকিল।

"এ্যাঁ?"

"কি খবর?"

"আমাদের মিটিং হয়ে গেছে।"

প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল, "মুভ্‌মেণ্ট সংক্রান্ত?"

"হ্যাঁ। আমরাও স্ট্রাইক করব। কাল থেকেই তা আরম্ভ হবে—ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলোতে পাঠিয়েছি। আস্তে আস্তে স্ট্রাইক বাড়বে আশা করছি। একটা তো হাওড়াতে চলছেই জানো বোধ হয়?"

"হ্যাঁ।" বিষ্ণু মাথা নাড়িল।

"সেখানে আজ শেখর গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল—এখনও আসে নি—অথচ—"

"শেখর—কোন শেখর?" প্রমথ মাঝপথে বাধা দিল।

"তোমার ভাই—এমন কর্মী আমি খুব কম দেখেছি প্রমথ।"

বিষ্ণু সায় দিল—"ঠিক বলেছ শঙ্কর—শেখর সকলের গর্বের বিষয়। তবে সে কম্যুনিষ্ট মতকেই বেশী বিশ্বাস করে।"

"হ্যাঁ—ভালো কথা"—শঙ্কর বলিল, "কম্যুনিষ্ট পার্টির সুমন্তের সঙ্গে দেখা হল।"

"তাদের কি মত ?"

"তারা কিছুই খুলে বলছে না। তারা বলছে—মুভ্‌মেণ্ট দ্বারা জাপানীদের সুযোগ দেওয়া হবে—তাছাড়া রাশিয়ার পরোক্ষে ক্ষতি করাও হবে।"

"বটে !" বিষ্ণু চুপ করিয়া ভাবিতে বসিল।

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওরা দেশের স্বাধীনতা কি চায় না ?"

শঙ্কর মাথা নাড়িল, "তা চায় বৈকি।"

"তবে ?"

"নিজের মত বজায় রেখে।"

দেশের স্বাধীনতা কি মতের উপর বা অন্য দেশের ক্ষতি-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে ? মত, মত, মত—প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে যায়। স্বাধীনতা না হলে কারও মত টিঁকবে না—আর যে রাশিয়ার কথা ওরা বলে—যার আদর্শে ওরা পাগল—সেখানে বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল দেশ স্বাধীন ছিল বলেই। আমাদের সে অবস্থা নয়। আর এ কথাটাই বা ওরা ভাবে না কেন যে স্বাধীনতার জন্য যাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ—সাম্যবাদের জন্যও তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে। আমরা তো একসঙ্গেই দুটো লাভ করতে পারি। কথার কূটনীতি দিয়ে স্বাধীনতা বা সাম্যবাদ কোনোটাই লাভ হয় না। লেনিনের একটা কথা আছে নেপোলিয়নের কাছ থেকে ধার নেওয়া—'First you enter a serious struggle then you see what happens'. ওদেরও তাই বল শঙ্কর—"

শঙ্কর মাথা নাড়িল, "ওরা বুঝবে না—"

প্রমথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "কেন বুঝবে না! ওদের বোঝাতেই হবে। স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচার কী অর্থ ? কেন ওদের এই আন্তর্জাতিকতার মোহ ? চল্লিশ কোটি মানুষ যে দেশে থাকে তা কি তাদের কাছে ছোট মনে হয় ? অন্য দেশের মুখের দিকে কেন আমরা চেয়ে থাকব ? না শঙ্কর, ওদের বোঝাতেই হবে। আমাদের সময় এসেছে। আর দেরি করলে আবার একশ বছর পিছিয়ে যাব।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "চেষ্টা তো করেছি—কিছু হল না। দেখি পরে কি হয়।"

প্রমথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ দেখ। আমার এখানে আসার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন দলকে এক করা। মানুষের নিজস্ব পৃথক পৃথক মত থাকা—তা ভালো লক্ষণ কিন্তু যে বিষয়ে দ্বিমত হওয়া উচিত নয় তাকে সিদ্ধ করার জন্য একযোগে চেষ্টা না করলে চলবে না। আমরা সব ভিন্ন ভিন্ন পথে চলছি—পথ শেষ হবে নিরাশায়। এক না হলে উপায় নেই।"

বিষ্ণু আর শঙ্কর নিঃশব্দে মাথা নাড়িল।

নিঃশব্দতা।

বাহিরে রাত্রির কালো ধমনীতে প্রশান্তি নামিয়াছে।

অন্ধকার আকাশে স্পন্দিত আলোর মেলা।

নিঃশব্দতা।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল, "এবার আমায় ফিরতে হবে।" (অনেক কাজ—অনেক কাজ)

বিষ্ণু প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

"বাড়ি। শেখরের আসার কথা ছিল, এখনও কেন যে সে এল না বুঝতে পা রছি না। প্রমথ তুমি বাড়ি যাও নি?"

"না।"

"এখন যাবে?"

"হ্যাঁ।" (মা, তোমার বড় দুঃখ।)

"তবে মাকে বলো যে ভাববার কিছু নেই—শেখর নিশ্চয়ই হাওড়াতেই আজ আছে।"

"আচ্ছা চল তবে।"

বিষ্ণু মাথা নাড়িল, "কিন্তু তোমার বাড়িতে থাকা উচিত হবে না প্রমথ—"

শঙ্কর সায় দিল, "হ্যাঁ—তুমি আমার এখানেই এস। তোমায় একটু লুকিয়ে লুকিয়েই কাজ করতে হবে।"

প্রমথ হাসিল, "আর লুকোচুরি খেলব না—যা আমার ন্যায্য প্রাপ্য, যাতে আমার অধিকার আছে তাতে লুকোচুরি কেন? যাই হোক, কাল আমি দুপুরের মধ্যে তোমার ওখানেই পৌঁছুব। বিষ্ণু, তুমি আমায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যেও।"

শঙ্কর বলিল, 'বেশ। তবে দেরি করো না, কারণ দুপুরে আমি থাকব না, তখন একটা মিছিল বের করতে হবে।"

বিষ্ণু বলিল, "বেশ তাই হবে।"

"চল প্রমথ।" শঙ্কর আহ্বান করিল।

"তবে আসি শঙ্কর।"

"এস ভাই।"

গলি হইতে রাজপথে পৌঁছাইয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ি চিনতে পারবে তো প্রমথ—ব্ল্যাক-আউটের যা ঝঞ্ঝাট—"

"সেই বাড়িই আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"তবে পারব।"

"আমি তবে আসি—আমায় তো উল্টো দিকে যেতে হবে—"

"আচ্ছা—"

অন্ধকারে শঙ্কর মিলাইয়া গেল।

প্রমথ চলিতে লাগিল।

রাজপথ।

অন্ধকার রাজপথ।

অন্ধকার ফুটপাথ হইতে কোনো ক্ষুৎকাতর হতভাগ্য কাঁদিয়া বলিল, "একমুঠো খেতে দাও গো—"

ক্ষীণ জনতার কোলাহল।

কলা-রসিকের দল নাটক দেখিয়া ফিরিতেছে।

"বেড়ে লিখেছে বইখানা—"

"না—মানে মন্দ নয়, তবে একটু মেলোড্রামাটিক—"

"আহা, জহর গাঙ্গুলীর পার্টটা চমৎকার হয়েছে—"

অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো মানুষেরা চলিয়াছে।

দূরে কোথায় যেন একটি পর্যবেক্ষণকারী বিমান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়।

"ও ভাই রিক্সা"—প্রমথ ডাকিল।

ঠিকানা বলিয়া সে রিক্সায় চড়িল।

আবছা আলোতে বড় বড় বাড়িগুলিকে ভূতুড়ে মনে হয়, রাস্তায় যেন মধ্যরাত্রির গভীরতা নামিয়া আসিয়াছে।

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—রিক্সার ঘণ্টা। চাকা ঘোরে।

একটি গলির মোড়ে শিকার-প্রত্যাশী দুইজন গুণ্ডা।

একটি ভদ্রলোক মাতাল নিজের পরিধেয় বস্ত্র মাথায় জড়াইয়া একজায়গায় পড়িয়া আছে।

একটি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ।

একজন লোক সিগারেট ধরায়। দেশলাইয়ের আলোতে ক্ষণকালের জন্য তাহার মুখ অর্ধালোকিত তৈলচিত্রের মতো মনে হয়।

নারীকণ্ঠের হাসি।

দক্ষিণের বায়ু বহিয়া যায়। তাহাতে সমুদ্রের বার্তা।

প্রমথর চিন্তা। মালয়ের নিবিড় অরণ্য। তরঙ্গময় সমুদ্রের কল্লোল ধ্বনি। শ্যামদেশের নর্তকী। যোশী, শ্যামাচরণ, কুন্দনসিং। কোথায় তারা? উত্তর ব্রহ্মের উদ্ধত পর্বতশ্রেণী। ইরাবতী। ঝড, বৃষ্টি, অনাহার, অনিদ্রা। অন্ধকাব রাত্রে আলোচনা। নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবনকারী রাজশক্তি। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু। কিন্তু ভয় কি? পরাধীন হয়ে যেদিন জন্মেছি সেদিন ভয় বিসর্জন দিয়েছি। ভয় করি না। মৃত্যু? শতবার মরব—শতবার জন্মাব। প্রতি জন্মের যৌবন, কর্ম, চিন্তা—আমার দেশের জন্য ব্যয় করব। আমি অবিনশ্বর। আঃ—অপূর্ব অন্ধকার রাত্রি। নিবিড় অরণ্যের মতো। ভালোবাসি—আমার দেশের প্রতি ধূলিকণাকে আমি ভালোবাসি। দেশ! অনেক কাজ! ধীরে ধীরে হবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সহজ বুদ্ধি, সহজ বিচার আর আন্তরিকতা চাই নতুবা কিছুই হবে না। জনশক্তি এবার পথ বাছবে—নেতারা নয়। নেতারা নির্বাচিত পথে সকলকে পরিচালিত করবে মাত্র। আঃ, ঘুম আসছে। কতদিন ভালো ঘুমোই নি। বাড়ি এসে গেল বলে। জায়গাটি চেনা বলেই মনে হচ্ছে! হ্যাঁ—এই জায়গাই বটে। ঐ তো সেই গলি। মা, বাবা, শেখর, দিলীপ, উমা, খোকন। কতদিন মাকে দেখি নি—

"আ গিয়া বাবু"—

গলি।

নিজের বাড়ি চিনিতে ভুল হয় না। ছয় বৎসর বাহিরে—তাহাতে কি। তুই একবার ভ্রম হয় বটে।

বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার সারা দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল।

ডাক। মৃদুকণ্ঠে।

"মা"—

আবার।

"মা"—

"কে?"—ভিতর হইতে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর শোনা গেল। আশঙ্কা ও ভীরু আশায় কম্পিত কণ্ঠ।

প্রমথ দরজার উপর হাত রাখিল। আহা, মায়ের কণ্ঠস্বর বড় দুর্বল। মা নিশ্চয়ই আরও দুর্বল, আরও ক্ষীণদেহী, আরও বার্ধক্যভারে ন্যুব্জা হয়েছে। দারিদ্র্য, চিন্তা, দুঃখ।

"কে?"

"আমি—দরজা খোল মা।"

দরজা খুলিল। ছয় বছর নয়, ছয় যুগ পূর্বেকার পরিত্যক্ত জগতের দ্বার খুলিল। দ্বারদেশে মা। তাহার পশ্চাতে হ্যারিকেনের আলোতে আলোকিত রিক্ত কক্ষ।

কল্যাণী প্রমথর দিকে চাহিল, "কে তুমি? তোমার গলা যেন কোথায় শুনেছি"—

প্রমথ মায়ের দিকে অগ্রসর হইল—"মা—আমি।"

কল্যাণীর দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, দরজার উপর এক হাত রাখিয়া সে বলিল, "তুমি—তুই প্রমথ!"

প্রমথ নতজানু হইয়া কল্যাণীর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

কল্যাণী নিঃশব্দে ছেলের মাথায় হাত দিল, বিড়বিড় করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বলিল। পরে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিল। তারপর আবার ছেলের নিকটে গিয়া তাহার মাথায়, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ কাঁদিয়া বলিল—"ভালো আছিস তো বাবা—এঁ্যা? আমি তোকে চিনতেই পারি নি—কি আশ্চর্যি। আয় ভেতরে আয়, ভেতরে আয়। খেয়েছিস? ওমা, আমি আবার জিজ্ঞেস করছি—মাথার আর ঠিক নেই বাবা—নে বোস—দেখি মুখখানা"—

"মা"—প্রমথ হাসিল।

"চুপ"—কল্যাণী হাসিকান্নায় অপূর্ব হইয়া বলিল, "কথা বলিস না, দেখি তোকে—কদ্দিন দেখি নি—আমি চিনতেই পারি নি। কি করে চিনব? যেমন চুল আর দাড়ি হয়েছে—একেবারে আমার ঠাকুর্দার মতো দেখতে হয়েছিস"—

ভিতরের ঘর হইতে ভবনাথের ডাক শোনা যায়, "কে গো? কার সঙ্গে কথা বলছ?"

কল্যাণী উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, "শীগগির দেখবে এস কে এসেছে!"

"কে?"

"দেখেই যাও না।"—

প্রমথ মায়ের দিকে চাহিয়া থাকে। মা আরও শীর্ণা, আরও দুঃখভারে প্রপীড়িতা হয়েছে। জননী জন্মভূমিশ্চ। মা আমার ভারতবর্ষের প্রতীক। কিন্তু কেন এই দীনবেশ মা? সিংহবাহিনী, তোর সিংহ কোথায়?

"কে গো?" ভবনাথ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিয়া প্রমথর দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

প্রমথ উঠিয়া আসিয়া পিতার পদধূলি লইল।

"কে তুমি?"

"আমি বাবা—প্রমথ।"

ভবনাথ কথা খুঁজিয়া পায় না। তাহার মন ভালো নয়। অভাব, মেয়ের অসুখ, ছেলেদের পাগলামী—সব কিছুই তাহার মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মধ্যে একি অবিশ্বাস্য ব্যাপার? প্রমথ - ফিরিয়া আসিয়াছে? প্রমথ—কাহার ছেলে?

"ভাবছ কি গো? প্রমথকে চিনতে পারছ না? কল্যাণী হাসিয়া বলিল।

"এ্যাঁ?" ভবনাথের চেতনা ফিরিয়া আসিল, "হ্যাঁ—চিনতে পারছি বৈকি কেমন আছিস রে?"

"ভালোই।"

"কোথায় ছিলি এতদিন?"

"মালয়ের দিকে।"

"কি করে এলি?"

উত্তরে প্রমথ সংক্ষেপে সব ব'লিল। সেই নির্জন রাত্রি। পুলিস। একজন মালয় দেশীয় নাবিকের গৃহে আত্মগোপন। তাহার নৌকার পাটাতনের নিচে লুকাইয়া ডাচ্ জাহাজে প্রবেশ করা। একজন মালয় খালাসীর সাহায্যে ইন্দোচীনের তীরভূমিতে তাহার অবতরণ। তারপর শ্যাম। উত্তর ব্রহ্ম। আসাম। অনেক দিন, অনেক অনেক কষ্ট আব অনেক দুঃখ, অনেক নদী আর অনেক পর্বত। ভারতবর্ষ।

কাহিনী শেষ হয়।

ভবনাথ হঠাৎ ছেলের দিকে চাহিয়া কি রকম যেন ভয় পায়। প্রমথর মুখে যে গাম্ভীর্য সে গাম্ভীর্য বড় অদ্ভুত। শেখর, দিলীপ—ওরাও গম্ভীর বটে। কিন্তু তাদের গাম্ভীর্য এমন অস্বাস্থকর নয়। প্রমথর চেহারা আরও রুক্ষ হয়েছে, ললাটে চিন্তার রেখা আরও জটিল হয়েছে। ও যেন আমার কেউ নয়, ওকে বেঁধে রাখার কোনোও শক্তি নেই। শেখর দিলীপ—ওদের উপর আমার হুকুম চলে—প্রমথর ওপর নয়। ও বিপ্লবী—মানুষের প্রতি ওদের মমতা নেই, মনুষ্যত্বটাই ওদের কাছে বড়। ভালো লাগে।

"হ্যাঁরে—এখানেই থাকবি তো? আর কোথাও যাবি না তো?" ভবনাথ প্রশ্ন করিল। ভয়ে ভয়ে। ছেলেরা তাহার নাগালের বাহিরে—কখন কে কোনদিকে চলিয়া যাইবে কে জানে?

"হ্যাঁ"—প্রমথ উত্তর দিল।

কল্যাণী প্রশ্ন করিল, "আর ভয় নেই তো?"

প্রমথ হাসিল, "কিসের ভয়?"

"পুলিসের?"

"সে ভয় কমবে না কোনওদিন, আর আমার নামে তো ওয়ারেণ্ট আছেই—"

"অ্যাঁ!" ভবনাথের আবার মাথার গোলমাল হইয়া গেল, "তবে? কি করবি? আর কোথাও যাবি—লুকিয়ে থাকবি?—"

"লুকিয়ে লাভ নেই"—প্রমথ মাথা নাড়িল।

"তাও বটে, কতদিন লুকিয়ে থাকবি?—"

কল্যাণীর চক্ষু মুহূর্তের জন্য দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কিছুই বলিল না।

"তবে?" ভবনাথ ভাবিয়া আকুল হয়, "কি করা যায় কিছু ভেবেছিস বাবা—হ্যাঁরে?"

"না। সে পরে ভাবা যাবে।"

কল্যাণী প্রমথর নিকট গিয়া বলিল, "খেতে চল প্রমথ"—

"আমি খেয়েছি মা।"

"হতভাগা—দুবছর পরে বাড়িতে ফিরে এসেছিস, একমুঠো খেতে না দেখলে আমার পেট ভরবে কি করে? আয়—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—যা, খেয়ে নে চাট্টি—" ভবনাথও বলে।

"মা—"

"কি?"

"আর সকলে কই?"

"আর সকলেও তো তোমারই মতো। কি যে ছন্নছাড়া রোগে তোদের

পেয়েছে বাবা (তোরা সব পাগল—তাই থাক)। শেখরটা কাল থেকে উধাও, আজ বাড়িতে আসবে বোধ হয়। দিলীপও বেরিয়েছে সন্ধ্যের পর—ওযে কি ভাবে দিনরাত (আমার সব ছেলেরা আগুনের ফুলকী)। উমা—"

"উমা। ওঃ, খুকীর কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ—আজকাল সে বড় হয়েছে, তুই দেখে চিনতেই পারবি না। এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে গলির মধ্যে যে উমা দৌড়াদৌড়ি করত সে এখন বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। কদিন ধরে বাছার বড় জ্বর—সারছেই না (ষাট্—ষাট্—মা আমার লক্ষ্মী)। চল না—দেখবি। হ্যাঁগো—ও এখনও ঘুমুচ্ছে তো ?"

ভবনাথ মাথা নাড়িল।

প্রমথ প্রশ্ন করিল, "আর সেই খোকন !"

"ওঃ—গোরা—ও ঘুমুচ্ছে। ওকে নিয়ে বড় দুঃখ বাবা—ও হাবা"—(ভগবান তুমি ওর মুখে কথা ফোটাও।)

"সেকি। না, কিছু বলা যায় না, ও ঠিক হয়ে যায় অনেক সময়। চল মা—ওদের দেখি—"

"চল—"

উমার শিয়রে দাঁড়াইয়া প্রমথ হাসিল। এই সেই খুকী। বাঃ, ভারি সুন্দরী তো আমার বোনটি। কিন্তু হায় বোন, এই সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ তো কোনও দিন হবে না। পরাধীনতা। স্বাধীনতা চাই। গলিত লৌহকে আঘাত কর, তীক্ষ্ণ বর্শাফলক নির্মাণ কর—যুদ্ধ হবে—আমাদের যুদ্ধ। কাল উঠে নগেনের সঙ্গে দেখা করব—তারপরে বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রথমে স্বাধীনতা চাই—পরে যার মতবাদই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ক্ষতি নেই। আসমুদ্র হিমাচল—অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চাই। আমাদের জয় হবেই। কিন্তু তার অন্তরায় মতানৈক্য। হয়! নানা স্বার্থের জন্যই নানা মত আর নানা দলের উৎপত্তি হয়েছে। স্বার্থ বিসর্জন দাও, একটিই মত তখন থাকবে যে আমাদের স্বাধীনতা চাই-ই। সাম্যবাদ ? সেও তো স্বাধীনতার জন্যই। স্বাধীনতারই রাজসংস্করণ সাম্যবাদ। কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া তো তার প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু বুঝতেই হবে—বোঝাতেই হবে। শক্তি দাও হে ভগবান—

কল্যাণী মেয়ের মাথায় হাত রাখিল, তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে বলিল, "না,—জ্বর কমে নি—"

ভবনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ—" (কি করব আমি? অদৃষ্ট—মেয়েটার কর্মফল। ছেলেটা আজ ফিরে এসেছে, কিন্তু পুলিস যদি ধরে? কি করি? কি করি?)

প্রমথ নিদ্রিত গোরার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে হাসিল। দিদির সেবা করিতে করিতে গোরা তাহার শয্যার একপার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিষ্পাপ মুখে একটি গভীর প্রশান্তি।

"চল্ বাবা—একমুঠো খেয়ে তুই জিরো—কত কষ্ট করে এসেছিস।" কল্যাণীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

রান্নাঘরের দ্বার পর্যন্ত ভবনাথ গেল।

কিন্তু হঠাৎ সে থামিল। না, আমি পুরুষমানুষ, আমার এতটা দুর্বলতা প্রকাশ করা ভালো না।

সে বলিল, "আমি যাই, উমার কাছে বসিগে। তুই খাওয়া সেরে নে, কেমন রে প্রমথ?"

"হ্যাঁ।"

ভবনাথ মনে মনে অভিমান বোধ করে। 'হ্যাঁ'। এ ছাড়া আর কিছুই কি ছেলেটা বলতে পারে না? আজ অনেকদিন পরে ওকে দেখে আমার যে আনন্দ হয়েছে তাও কি বুঝতে পারে না? একটু হেসে আরও কিছু কি বলতে পারতো না ছোকরা? মায়ের সঙ্গে খুব কথা হচ্ছে—হাঃ। আরে, আমি না থাকলে তুই কোথায় থাকতিস? যাকগে—একটা বিড়ি খাইগে।

ভবনাথ উমার নিকট গেল।

কল্যাণী ভাত বাড়িতে বসিল।

"জান মা"—প্রমথ বলিল।

"কি?"

"দিলীপকে যেন রাস্তায় দেখলাম। ঘণ্টা দেড়েক আগে। একবার ডাকলাম—শুনতে পেল না, কিংবা হয়তো আমারই ভুল।"

"হতেও পারে—ওই। পাগলের মতো ভাবে আর টোঁ-টোঁ করে ঘুরে বেড়ায়। ও খুব গল্প লেখে, জানিস্?"

"না তো—আচ্ছা, পড়ে দেখব। শেখরটাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন যেন—"

"ওই আর একজন। তোদের নিয়ে আমার এক জ্বালা হয়েছে (জ্বালা নয়, তোরা মানুষ বলে আমার গর্ব হয়)—খালি মুটে মজুর নিয়ে কাজ করে—"

"ভালোই তো মা! হ্যাঁ, একটা কথা—ও হয়তো আজ নাও আসতে পারে—শঙ্কর বলছিল।"

"তাই নাকি!" কল্যাণীর চোখে হতাশা, "বাঃরে, ওর জন্যে যে আজ একটু রেঁধেছিলাম ভালো করে, হতভাগা কি কিছু খায়? ওর অদৃষ্ট, আমার কি? নে বাবা, তুই খা।"

প্রমথ মায়ের দিকে চাহিয়া হাসিল।

কল্যাণী হঠাৎ কি মনে পড়ায় ভাতের থালায় হাত দিল। তরকারী ঢালিয়া হাসিমুখে ভাত মাখিল, তারপর খানিকটা হাতে লইয়া বলিল, "ছোটবেলায় বছর বারো বয়স পর্যন্ত আমি না খাইয়ে দিলে খেতিস না, মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আজও খা দেখি চাট্টি—"

"আমার বয়স এখন তো আর বারো নয়, মা।" (মা তোমার এত দয়া! মা অন্নপূর্ণা, কেন এই ছলনা?)

"তোরা আবার বড় হয়েছিস কোথা—নে খা।"

প্রমথ খাইল।

কল্যাণীর যেন হঠাৎ বয়স অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে সজল চাঞ্চল্য, আনন্দ।

"মা—"

"কি রে?"

"মা—"

"কি ?"

"মা—"

"কি বাবা ? বল—"

প্রমথর চোখে জলের ছায়া।

"আমি তোমার অধম সন্তান মা—"

"পাগল—"

"মা, তুমি আশীর্বাদ কর।"

"কি জন্য।"

"দেশকে যেন স্বাধীন করতে পারি।"

কল্যাণীর চক্ষু আবার জলিয়া উঠিল, ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "কোনও দেশ চিরদিন পরাধীন থাকে না বাবা—তোদের আশা পূর্ণ হবে।"

"তুমি তাহলে আমাদের বিশ্বাস কর মা!"

"করি বইকি, যা সৎ, ন্যায়—সব কিছুকেই বিশ্বাস করি—স্বাধীনতা চাওয়া তো শুধু, সৎ ন্যায় বা সত্য নয়, ও তারও বেশী—ও তোদের অধিকার। তাকে আদায় করে নে তোরা।"

প্রমথর মুখ আনন্দে, আশায় উত্তেজনার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, তোমার দুঃখ, তোমার অভাব দূর করতে পারলাম না—তোমার সংসারের কোনো কাজই করলাম না, কেবল অকৃতজ্ঞের মতো নিয়েই যাচ্ছি, দিচ্ছি না কিছুই।"

কল্যাণীর চোখে জল আসে, মাতৃস্নেহের রসধারা। নাইবা দিলি—তোর আমার সম্বন্ধ কি দেনা-পাওনার ? দুঃখ ? অভাব ? কি যায় আসে তাতে—মুখে না বললেও অন্তরে আমি জানি তোরা সব আমার গর্বের বস্তু। তোরা মানুষ হতে চাস—মনুষ্যত্ব ছাড়া যে বাঁচা উচিত নয় তা তোরা বুঝেচিস, আর আমি কি চাইব ? খ্যাতি, ঐশ্বর্য ? সেইটাই কি মানুষ হওয়ার মাপকাঠি ! না, তোরা আরও দুঃখ পা, আরও দুর্গম পথের পথিক হ, দেশকে তোরা স্বাধীন কর, মানুষকে তোরা ভালোবাস, ভগবানকে তোরা পৃথিবীর বুকে টেনে আন। সেই তো আমি চাই—তাতেই তোদের মাতৃঋণ শোধ হবে।

খাইতে খাইতে প্রমথ ভাবে। ঠিক, অধিকার। আদায় করতে হবে। সূর্যলোকে ছাড়া কি গাছ বাঁচে? আমরা বাঁচতে চাই, মানুষের মতো বাঁচতে চাই, অতএব স্বাধীনতাও চাই। কবে? তা ভেবে লাভ কি? সময়ে সব হবে। এখন চাই ঐক্য, উদ্যম, সাহস, সহানুভূতি। হিন্দু, মুসলমান, সাম্যবাদী আর অহিংসবাদী—আমরা প্রত্যেকে সুসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট নই। আমরা পৃথক পৃথক কিছুই করতে পারি না—তাহলে নামরা অসহায়, বিচ্ছিন্ন। এক না হওয়া পর্যন্ত আমরা ভগ্নস্তূপ। প্রাণপণ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে ভাই সব। অন্ধকারে আমাদের জীবন, মন আচ্ছন্ন—তাই এত বিবাদ, এত মতানৈক্য, এত অর্থহীন কোলাহল। আমাদের জীবনের সূর্য কোথায় গেল? ভয় নেই···সে সূর্যকে আমরা লাভ করবই। তার প্রখর দীপ্তিতে আমাদের কুসংস্কার, আমাদের জড়তা, আমাদের দৈন্য, আমাদের ভীরুতা সব দূর হবে, দূর হবে।

"ও কটি ভাত খেয়ে নে বাবা—"

"না মা, পেট ভরে গেছে, বহুদিন—বহুদিন পরে আজ পেট ভরেছে।"

কল্যাণীর চোখে আবার জল আসে।

ভবনাথ উমার শিয়রে বসিয়া বেশ আয়েস করিয়া ধূমপান করিতেছিল। প্রমথ ঘরে ঢুকিতেই ভবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "খেয়েছিস বাবা?"

"হ্যাঁ বাবা।"

ভবনাথ আর কথা খুঁজিয়া পায় না। কি যে বলি? ওদের সবাই এমন গম্ভীর হয়ে থাকে। আমার চেয়ে ওরা কত জ্ঞানী। ওরা আমার ছেলে। তাই হয়। মানুষের বুদ্ধি বাড়ছে। ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারি না। দাড়িতে ছেলেটাকে সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে। পাগল।

উমা হঠাৎ কি যেন বিড়বিড় করিয়া বলিল।

ভবনাথ চমকিয়া মেয়ের মুখের কাছে কান লইয়া বলিল, "কি বলছ মা, কি?"

উমা আরক্ত নয়ন মেলিল। জ্বর-বিকারে আরক্ত নয়ন।

"তোর বড়দা এসেছে রে খুকী—ও মা, শুনছিস?"

প্রমথ উমার পাশে বসিয়া তাহার ললাটে হাত দিয়া বলিল, "খুকী—তুই এত বড় কবে হলি ভাই ?"

উমা কিছু বুঝিল না, একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, "ভালো না ...ওদের চোখ ভালো না। ওদের আত্মা বড় কলুষিত। ওরা তাকায় না, লেহন করে। কালো চোখ। মা, ভাতে জল দিও না, মেজদা বাড়ি ফেরে নি। ছোড়দা কি ভাবছ ? ভাবনা ..পক্ষীরাজে চড় না কেন ?"

প্রমথ পিতার মুখের দিকে চাহিল, "জ্বর বেড়েছে—এ বিকার।"

"অ্যা !" ভবনাথ একমুহূর্তে অসহায় হইয়া গেল। কি করি তবে ? এত রাতে ডাক্তার কোথায় ?

উমা আবার বলিল, "স্বপ্ন দেখেছি। বিচিত্র দেশ। তার মধ্যে এক বিরাট প্রাসাদ, তার চারিদিকে রংবেরংয়ের ফুল। উঃ কত ফুল ! প্রাসাদের মধ্যে কেউ নেই—কেউ নেই—মা, আলোটা জ্বালিয়ে দাও—"

কল্যাণী ভিতরে আসিল, "শেখর আর দিলীপটা এলে বাঁচি, এত দেরি কেন যে করে—"

"মা—" প্রমথ বলিল।

"কি রে ?"

"খুকীর জ্বর বেড়েছে—প্রলাপ বকছে। ওর মাথায় জলপটি দাও—"

"সে কিরে !" কল্যাণীর মুখমণ্ডল মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। দ্রুতপদে মেয়ের নিকটে গিয়া সে তাহার উত্তাপ অনুভব করিল। তাহার ঠোঁট দুইটি পরক্ষণেই একবার থরথর করিয়া উঠিল।

বাহিরের দরজায় কে যেন সজোরে করাঘাত করিল।

"দিলীপ বাবু—দিলীপ বাবু" উচ্চকণ্ঠের ডাক।

"কে ?" ভবনাথ চমকিয়া উঠিল, "পুলিস নয় তো ?"

প্রমথ মৃদু হাসিল, "না—দেখি—"

কল্যাণী বাধা দিল—"না বাবা, তুই যাসনে, তোর বাবা আগে গিয়ে দেখুক।"

ভবনাথ মাথা নাড়িল, "আচ্ছা, আমিই দেখছি।"

শঙ্কিতপদে, ভীরু চিত্তে ভবনাথ দরজা খুলিতে গেল। আশঙ্কায় সকলেরই বুকের স্পন্দন বাড়িয়া গেছে।

দরজা খুলিল।

একটি লোক।

"কি চাই?" ভবনাথ প্রশ্ন করিল।

"দিলীপবাবু নেই?" লোকটি জিজ্ঞাসা করিল।

"না।"

"বড় দরকার—আমি হাওড়া থেকে আসছি। শেখরবাবু—"লোকটি থামিল।

"কি হয়েছে?"

প্রমথ ও কল্যাণীও সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

লোকটি একটু থামিল, সকলের মুখ একবার দেখিয়া বলিল, "শেখর-বাবুকে কারা যেন ছোরা মেরেছে, তাঁর লাস হাসপাতালে—"

"কি?" ভবনাথ আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

"শে-খ-র্"—কল্যাণী উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল!

প্রমথ তাহাকে ধরিল, শান্ত, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কাঁদবে মা! তুমি যে বীরমাতা—"

"অ্যা?" কল্যাণী হঠাৎ থামিল, "কাঁদব না? বেশ, তবে কাঁদব না—"

লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। সে নম্রকণ্ঠে বলিল, "এ দুঃসংবাদ চেপে লাভ নেই বলেই এসেছি। আমায় ক্ষমা করবেন। যদি তাকে দেখতে চান, তবে ভোরবেলায় হাসপাতালে যাবেন। আচ্ছা, তবে আমি আসি—"

লোকটি দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

উমা প্রলাপ বকিতেছে—"চুপ—কথা বলো না, কথা বললে এমন গান নষ্ট হয়ে যাবে। কি বলছ? আমি কে? আমি কেউ না। আমি একটি গরিবের মেয়ে। অনাহারের বড় জ্বালা, তা জান? কেন গরিব? বিধাতা জানে। বিধাতাকে চেন না? সেই যে অন্ধ লোকটা, বসে বসে কেবলই চাকা ঘোরায়—কালের চাকা গো, কালচক্র। আহা, কে ও! বড় সুন্দর তো! কিন্তু ওকি চাউনি!—"

"গেল—বুকটা জলে গেল। শেখর, ওরে ও শেখর—ফিরে আয় বাবা। আমি কি করি এবার? দেশ, সমাজ—কি হবে এ দিয়ে ওরে সোনামানিক, ফিরে আয়—" ভবনাথ ছেলেমানুষের মতো কাঁদে।

গোরার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে সবাই কাঁদিতেছে। একজন কে অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া মাকে বোঝাইতেছে—সে কিছুই বুঝিতে পারে না। নিঃশব্দে সে দিদির শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। দিদিও যেন কি বলিতেছে। কি?

"কেঁদো না মা। আমাদের পরিণতি এমনিই। কিন্তু সেই তো তোমার মাতৃত্বের গর্বের বস্তু। প্রাণ দেওয়া কি সহজ কথা মা, তোমার মতো মায়ের ছেলে না হলে তা দেওয়া যায় না। তুমি একা নও মা, তোমার মতো কত মা এমনি কাঁদছে। তোমাদের কান্না বন্ধ করতে হলে যা দরকার তাই যেন এবার আমরা লাভ করি। (দুঃখিনী ভারতবর্ষ—মায়ের মতো। সেও হাহাকার করে কাঁদছে)। কেঁদো না মা—অভিশাপ দাও—"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, চোখ মুছিল, ভগ্নকণ্ঠে, নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল, "না, আমি কাঁদব না। কিন্তু আজ শেখর আসবে বলে ওর জন্য চাটি ভালো করে রেঁধেছিলাম, কিন্তু এল না, হতভাগা এল না—"

পদশব্দ। অনেকের পদশব্দ।

"হ্যাণ্ডস্ আপ্—নড়বেন না প্রমথবাবু—" দ্বারপথে একজন পুলিস সার্জেন্ট, তাহার হাতে পিস্তল। পশ্চাতে দুইজন পুলিস আর একজন কোট-পরিহিত লোক।

"কি চাই, কাকে চাই, কেন?" ভবনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

সার্জেন্টটি বাঙ্গালী, সে নম্রকণ্ঠে বলিল, "প্রমথবাবুকে, কেন তা তো জানেন। উনি ফেরারী আসামী—

"আজ না, আজ ওকে ছেড়ে দিন। আজই ও ফিরে এসেছে, আজ আমার মেজছেলেকে কারা খুন করেছে—আজই আবার ওকে নিয়ে যাবেন? না—না—"

"কি করব বলুন, আমরা কর্তব্যের দাস—উপায় নেই।"

কল্যাণী চুপ করিয়া ছিল, এতক্ষণে ছেলেকে বলিল, "তোকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কি করি মা ? আজ তুমিই পথ বলে দাও মা—জোর করে আমায় মৃত্যু্ও নিয়ে যেতে পারে না, এরাও পারবে না, বল—পালাব ?'

কল্যাণীর চোখে জল অথচ আগুন, "কেন পালাবি ? আর সেই পুরানো পথ নয়—সকলের সঙ্গে মিলে কাজ করবি। দেশের জনতা যেদিকে যায়—সেদিকে যাবি। একা কি করতে পারিস বাবা ? জেলকে ভয় কি ? তোদের বন্ধ করে কি ক্ষতি করবে তোদের ? তোদের আত্মা ? সে তো তোদের হৃদয়ের জিনিস—তাকে কে ছোঁয় ? যা, কারাগারেই যা—যেদিন তোদের আত্মার স্বপ্ন সত্য হবে, সেদিন ওই কারাগারের প্রাচীর দেখবি ধুলো হয়ে ভেঙে পড়বে। বিশ্বাস রাখিস বাবা—ভয় পাস নে—"

"প্রমথবাবু—" সার্জেণ্ট ডাকিল।

কোট-পরিহিত লোকটি সিগারেট টানিতে টানিতে মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

"না, আমি যাই। আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না, একদিনে এমনি আঘাতের পর আঘাত—না, আমি যাই। একটা ছেলে মরল, আর একটা ছ-বছর পরে ফিরে এসেই আবার জেলে যাচ্ছে, মেয়েটা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, একটা ছেলে পাগল, ছোটটা বোবা, আমি বুড়ো, দরিদ্র—বাঃ বাঃ—ভগবান তুমি বড় দয়ালু—বড় দয়ালু—"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া ভবনাথ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পাগলের মতো।

নিঃশব্দতা।

উমা প্রলাপ বকিতেছে।

গোরার হঠাৎ কান্না পাইয়াছে। নিঃশব্দে সে কাঁদে।

কল্যাণী স্থির। তাহার দৃষ্টিও স্থির। তাহার চোখের জল শুকাইয়াছে।

কোট-পরিহিত লোকটি দরজার বাহিরে থুথু ফেলিল।

সার্জেণ্টের চোখে সমবেদনা।

পুলিস দুইটি কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো নতদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান।

বাহিরে দূরে একটি কুকুর যেন কোথায় চিৎকার করিতেছে।

নিঃশব্দতা।

"মা—তবে যাই ?"

কল্যাণী নড়িল না। একবার শুধু প্রমথর দিকে চাহিল।

"মা—এবার আসি—"

প্রমথ মায়ের পদধূলি মাথায় নিল।

কল্যাণী নড়িল না, কিছু বলিল না। একইভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

"সার্জেণ্টসাহেব চলুন।"

"চলুন।"

"আবার পিস্তলটা এনেছেন কেন ? আমি নিরস্ত্র।"

"আপনাদের সত্যি বলতে কি—একটু ভয়ই হয়, তাই এই সতর্কতা।"

"আর ভয় নেই—ওসব বর্জন করেছি। নিন, চলুন।"

"চলুন।" সার্জেণ্ট একটু অগ্রসর হইয়া কল্যাণীর প্রতি করজোড়ে বলিল, "মা, আমায় মার্জনা করবেন, আমার দোষ নেই। আমি কর্তব্যের দাস—"

কল্যাণী কিছুই বলিল না।

কোট পরিহিত লোকটি হঠাৎ পুলিস দুইটিকে বলিল, "হুঁসিয়ার জী, কোই আতা হ্যায়—

শঙ্কর প্রবেশ করিল।

"একি প্রমথ! এড়াতে পারলে না ?" সে প্রশ্ন করিল।

প্রমথ হাসিল।

শঙ্কর একটু স্থির থাকিয়া পরে নিম্নকণ্ঠে বলিল, "আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি ভাই—" তাহার কণ্ঠস্বর ভগ্ন।

প্রমথ আবার হাসিল, "শেখরের বিষয়ে ?"

"হ্যাঁ—সে নেই।" (প্রতিশোধ। মায়ের অপমান আর শেখরের মৃত্যুর প্রতিশোধ।)

"জানি, ভগ্নদূত এসেছিল হাওড়া থেকে। দেখছ না মা কেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"আর বাবা?" (সব ভেঙে যাবে—হে বঞ্চক, দিন ফুরিয়েছে।)

"সামলাতে পারেন নি—বেরিয়ে গেছেন।"

শঙ্কর চুপ করিল, পরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "উপায় নেই, আমাদের এমনিভাবে অনেক প্রাণ দিতে হবে। খ্রীষ্টের রক্তেই খ্রীষ্টধর্ম গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একথা জেনে রেখো—শোধ আমি নেবই।" (দিবারাত্র আমি মারণাস্ত্রে শাণ দিচ্ছি—ওরা মরবে।)

কল্যাণীর নিকটে গিয়া সে আবার বলিল, "মা, আপনার দুঃখ—আমারও দুঃখ। কিন্তু মা, আমিও আপনার ছেলে, ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই—"

কল্যাণী কিছুই বলিল না।

"চললাম প্রমথ—কালকে হাজতে দেখা করব—"

দ্রুতপদে শঙ্কর চলিয়া গেল।

কোট পরিহিত লোকটি সার্জেণ্টকে কি যেন বলিল।

সার্জেণ্ট মাথা নাড়িল, "না, ওকে চিনি—দরকার পড়লে ধরব।"

"চলুন—" প্রমথ বলিল।

"হ্যাঁ—এই যে আসুন।"

"চললাম মা—" দ্বারপ্রান্ত হইতে প্রমথর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।

তাহারা রাস্তায় নামিল।

ক্রমে তাহাদের পদশব্দ মিলাইয়া গেল।

নিঃশব্দতা।

উমা প্রলাপ বকিতেছে, "আমি সুন্দর! সত্যি? দেখি আরশিটা—হ্যাঁ, সত্যিই তো আমি সুন্দর! তুমিও সুন্দর। তোমায় কতদিন দূর থেকে দেখেছি। কতদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঘুমের ঘোরে তোমার স্বপ্ন দেখেছি। রাজপুত্র, তুমি কবে আসবে? একি! তোমার চোখে ও কদর্য ইঙ্গিত কেন?"

গোরা তখনও কাঁদিতেছে। পুলিস এসেছিল। অচেনা লোকটা কে? তাকে পুলিসেরা নিয়ে গেল কেন? মা কি ভাবছে? আমার ভয় করছে—

"মাঃ"—প্রাণপণ চেষ্টায় সে ডাকিল।

কল্যাণী দরজার দিকে এতক্ষণে চাহিল, বিড়বিড় করিয়া অস্ফুটস্বরে সে বলিতে লাগিল, "নিয়ে গেল—ওকে নিয়ে গেল। নিয়ে যাক, ওরা আগুন নিয়ে খেলছে—ওরা পুড়বে। ওরে নির্বোধ—ওরে অমানুষের দল, মানবাত্মার দাবীকে তোরা কতদিন দাবিয়ে রাখবি? (শেখর) নিজেদের চিতা তোরা কেন জ্বালাচ্ছিসরে হতভাগারা—কেন তোরা সর্বনাশকে ডেকে আনছিস? তার আগেই তোরা মর—"

"মাঃ"—গোরা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে।

কল্যাণী আবার চমকিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে পিছন ফিরিয়া গোরার দিকে চাহিল, তারপরে ছেলের নিকটে গিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া মেয়ের নিকট গেল।

উমা তখনও প্রলাপ বকিতেছে। অর্থহীন, আবোল-তাবোল।

কল্যাণী নিঃশব্দে জলপটি লইয়া মেয়েব শিয়রে বসিল।

গোরাও আসিয়া মায়ের পাশে বসিল।

নিঃশব্দতা। কেবল উমার প্রলাপের শব্দ শোনা যায়। উত্তপ্ত জলের ভিতর হইতে যেমন দ্রুত বুদ্বুদ উঠে তেমনি ভাবে তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অদৃশ্য অন্ধকার হইতে অসংখ্য কথার বুদ্বুদ উঠে। কত কথা!

প্রলাপ। সেই যে ছেলেটি হেসেছিল সেদিন, কি সুন্দর তার মুখটি! কিন্তু তারও চোখ কদর্যতার আগুনে জ্বলছিল, ভয় লেগেছিল। কেন অমনভাবে ওরা তাকায়? অন্ধকার। আগুন জ্বালাও—তাতে পুড়ে মরব। অস্ত্র আন—অস্ত্র আন—সমস্ত কদর্যতাকে নিশ্চিহ্ন কর। চুপ—কথা বলো না। কি ভাবছ ভাই?

কল্যাণী প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল।

"মা"—দিলীপ আসিল। তাহার উদভ্রান্ত দৃষ্টি, স্খলিত-চরণ।

কল্যাণী উত্তর দিল না।

দিলীপ নিজের ঘরে গেল।

কিছুই ভালো লাগিতেছে না। বাতি নিভাইয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

সময় কাটে। উমা প্রলাপ বকিতেছে। বকুক, মরুক। তপন। ঘরের ভিতর একটা চাপা ভাব, যেন কেউ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কিসের প্রতীক্ষা করছে। তপন। মৃত্যু। মানুষ মরছে। আমাদের কি করতে হবে? দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, পরাধীনতা, হিংসা। দূর কর। অমৃতং দেহি। অতিকায় দৈত্যের বল দাও আমার প্রাণে, অতিমানবের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দাও আমার বুকে, সমস্ত সৌন্দর্যের নির্যাস দাও আমার ধমনীতে। দাও দাও—

"দিলীপ—"

"কে রে?"

"আমি—তপন।"

"এঁ্যা!"

অন্ধকার ঘরের মধ্যে কাহার নিঃশ্বাসের শব্দ।

"হ্যাঁ, আমি তপন—"

"কোথায়?"

কাহার স্পর্শ।

অন্ধকারে তপন ভাসিয়া উঠিল। পাণ্ডুর, বিবর্ণ, শীর্ণ। নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি। তাহার চতুর্দিকে আরো অনেক মুখ—অনেক মুখ। সকলেই তপনের মতো দেখিতে। আরও—আরও মুখ। দিলীপের ক্ষুদ্র কক্ষ যেন বিরাট পৃথিবীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

"ওরা কারা—" সে ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"ওরা—আমি, তুই—শিল্পীরা—"

"কি চাস্ তুই?"

"সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দে—ওরে শিল্পী, তোর কর্তব্য বড় গুরুতর—"

ঘরের অন্ধকার ক্রমে আরও নিবিড় হইতেছে।

মাথাটা ফাটিয়া যাইবে বোধ হয়। তপন। মৃত্যু। আমি দুলছি—দোলক—আশা, নিরাশা, ভয়, সাহস, দ্বিধা, সংশয়। বাড়িটা কি দুলছে! সভ্যতা—ওঃ—

হঠাৎ দিলীপ চিৎকার করিয়া উঠিল, "কোথায় গেলি তপন? দেব, মোড় ঘুরিয়ে দেব—শুনছিস, তোর কথা আমি রাখব—"

কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার।

সে ফিরিয়া গিয়া হ্যারিকেন লইয়া আসিল।

"কি হল রে দিলীপ?" ভাবলেশহীন কণ্ঠ কল্যাণীর।

দিলীপের দৃষ্টি ঝাপসা, মায়ের দিকে এমন ভাবে চাহিল যেন সে বহুদূর হইতে কোনও বস্তু লক্ষ্য করিতেছে।

"কি হল বাবা, স্বপ্ন দেখছিলি?"

"স্বপ্ন! হ্যাঁ, আমার স্বপ্ন সত্য হবে—সাবধান শয়তান, আমার স্বপ্নকে তুমি ভেঙো না—"

"রাতদুপুরে একি হোল তোর?"

"কিছু নয় মা, কেবল পাগল হয়ে গেছি"—"চিৎকার করিয়া ঘরময় পায়চারী করিতে কবিতে দিলীপ বলিল, "জান মা,

'একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়নপরে অন্তিম নিমেষ।'

"ভয় পাচ্ছ নাকি মা?"

কল্যাণীর চেতনা নাই।

"কথার জবাব দিচ্ছ না! আমার কথা শোন, সূর্যকে এনে দাও আমার কাছে..."

"দিলীপ...."

"ওঃ...অসম্ভব বুঝি? বেশ তা হলে এবার

'আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।'

মা…"

"এঁ্যা ?"

"নাচব ? তাণ্ডব না লাস্য, কোনটা দেখবে ?"

উমার প্রলাপ। এমনি দিনের পর দিন কেটে যায়…সুরভিত পুষ্পমালা ধুলো হয়ে যায়, জীবন মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয়, মরুভূমির বুকে পদচিহ্ন মিলিয়ে যায়! ভাব, এর চেয়ে বড় কি কিছুই নেই ? কে, কে বাঁশি বাজাচ্ছে গো ?

"দিলীপ…ঘুমো বাবা"…কল্যাণী ক্লান্ত কণ্ঠে বলে।

"না তা হয় না…

'চাব না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি—'

"দিলীপ—ওরে থাম্…"

দিলীপ থামে না,—

"শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

কল্যাণীর সারা দেহ কাঁপে। রাত গভীর। শেখর মৃত, প্রমথ বন্দী, ভবনাথ বাহিরে, উমা বিকারগ্রস্থ, গোরা মূক শিশু আর সে নারী, মাতা। সহ্যের সীমা আছে বই কি। দুঃখের দুর্যোগ একদিনেই এমনিভাবে তাহার মস্তকে ভাঙিয়া পড়িবে কে জানিত? তাহার উপর দিলীপ পাগলের মতো কি যে বলিতেছে। সে কি করিবে? পুত্র-শোক, পুত্র-বিরহ তাহার হৃদয়ে ক্রমশ পাষাণের মতো ভারী হইয়া উঠিতেছে। অথচ সে কাঁদিতে পারিতেছে না। সে কি করিবে?

"ওরে শুয়ে পড়"....সে আবার বলিল।

দিলীপের টানাটানা চোখে ঘোলাটে, অর্থহীন দৃষ্টি, সবেগে মাথা নাড়িয়া কান্নার স্বরে সে বলিল,..."না, না, আর দেরি নয়...

'হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন'
কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই কুমার কার্তিকেয়?"

কল্যাণীর ঠোঁট আবার থরথর করিয়া কাঁপে, "কেন তোর এমন হল দিলীপ, ও বাবা...ও খোকা...ও খোকন-মণি..." (শেখর-প্রমথ-শেখর-প্রমথ ....শেখর...উঃ)

"আদর করছ বুঝি? কর....ther's something rotten in the state of Denmark, মা"...

"কে?" (শেখর....প্রমথ...শেখর....প্রমথ...শেখর...)

"যদি হঠাৎ মরে যাই?"

তীরাহত পাখির মতো কল্যাণী আর্তস্বরে বলিল, "ওরে না, আমার কোল খালি হয়ে যাবে...আমার কোল খালি হয়ে যাবে...(শেখর...প্রমথ....শেখর ...প্রমথ...শেখর...)

ছুটিয়া গিয়া সে ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "ঘুমো বাবা, এবার—

রাত হয়েছে—" (হায়রে পাগল—জান না কি হয়েছে। শেখর···শেখর· প্রমথ—উঃ—)

"ভয় পাচ্ছ বুঝি? ভয় কি? মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান—' বাঃরে বিলাসী কবি! মা"—

"কি?"

"আমায় জন্ম দিলে কেন মা? বড় দুঃখ—"

এইবার কল্যাণী গর্জিয়া উঠিল, "চুপ কর। ওরে ভীরু, দুঃখকে দূর করবার জন্যই তো তোর জন্ম—ওরে কাপুরুষ, দুঃখ দেখে পিছিয়ে যাস! এতটুকুতেই তুই পাগল হয়ে যাস?" (আমার দুঃখ কি জানিস বাবা? বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে—ভেঙে যাচ্ছে—শেখর···শেখর···শেখর····শেখর—)

মায়ের গর্জনে হঠাৎ দিলীপ চমকিয়া উঠিল। সে থামিল, মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মায়ের চক্ষু জ্বলিতেছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, স্ফুরিত অধর, কম্পমান দেহ। তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মস্তিষ্কে যেন প্রশান্তি নামিল, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল।

সে হাসিল, "হ্যাঁ মা, আমি কাপুরুষ—আমি সহ্য করতে পারছি না—"

"কি?" (আমি কাঁদতে চাই—)

"অভাব, মৃত্যু, হিংসা, কদর্যতা—"

"ওরে পাগল, অমৃতপানের আগে যে বিষপানই করতে হয়।"

"তাহলে কি করি মা? আমি দুর্বল, আমি অক্ষম—"

"হ্যাঁ, তুই দুর্বল কিন্তু অক্ষম নস, তুই শিল্পী! তুই তোর স্বপ্নকে রূপ দিবি, মানুষের কাছে তা প্রচার করবি। মানুষের নির্বুদ্ধিতা দূর করবি তুই, তাদের পথপ্রদর্শক হবি। তুই গান গাইবি—অগ্নিরাগের গান—তা মৃতকে প্রাণ দেবে, দুঃখকে সুখ করবে—হিংসাকে ভালোবাসা করবে—" (শেখর··· শেখর···প্রমথ···শেখর····শেখর···শেখর···প্রমথ—আমি কাঁদতে পাচ্ছি না—)

দিলীপ কান পাতিয়া শুনিল তারপর সে মাথা নাড়িল, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ—তাই হবে—কিন্তু—

'Sombre the night is,

And, though we have our lives, we know

What sinster threat lurks there—'

না না, আর না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এবার আমি শুই মা, কেমন ?"

"শোও বাবা—" (না, আমি বীর মাতা—)

উমার প্রলাপ। ভূমিকম্প হবে, পাহাড় পর্যন্ত ভেঙে পড়বে। সমুদ্র এসে আছড়ে পড়বে স্থলের ওপর—লাল রক্তে সব লাল হবে। সূর্যের আলো নিভে যাবে—চাঁদ সমুদ্রে ডুববে—সাবধান—সাবধান।

দিলীপ শয্যায় শুইল। ক্রমে সে প্রকৃতিস্থ হইল।

সে ভাবে। ঠিক, মা ঠিক বলেছে। বিষপান করতে হবে। তারপরে অমৃতপান। তখন এই অভাব কোথায় ? তখন অনির্বাণ সৌন্দর্যের সাধনায় সমুজ্জ্বল প্রাণমন। মৃত্যু ? কত মরবে ? জীবনকে কে চেপে রাখবে ? মৃত্যু, অন্ধকার, জীবন আলো। আলোর প্রকাশে অন্ধকার পালাবে। আমি কবিতা লিখব। তপন বলেছিল। আঃ—বাইরে কি অন্ধকার (দূর হবে)—আকাশে নক্ষত্র আছে। পৃথিবীতে ফুল ফুটছে এই অন্ধকারে। শবদেহের উপর সবুজ তৃণ জন্মাবে। জীবন অপরাজেয়। সে অনির্বাণ অগ্নিশিখা—তার নির্বাণ নাই। নির্বাণ কামনার হোক, নির্বাণ লোভের হোক, নির্বাণ হিংসার হোক। ভাই মানুষ, কথা শোন, জীবন বড় সুন্দর। ভাই মানুষ, আমার মিনতি, মানুষকে ভালোবাস। ভাই মানুষ—সূর্যালোকে নিজেকে দেখ—তোমাকে পিশাচের মতো দেখাচ্ছে। চন্দ্রালোকের সঙ্গীত ভেসে আসছে। কারা যেন আগামী যুগের উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে। ভয় নাই—এখনও আমাদের আত্মা পথভ্রষ্ট হয় নাই। ভাই মানুষ, নূতন পথে এস। শৃঙ্খল ভাঙ—তোমার অন্তরের অসি দূরে নিক্ষেপ কর। বহু যুগের সাধনাকে নিষ্ফল করো না, স্বরচিত অট্টালিকাকে ভেঙো না—দেখ,—গ্রহে, উপগ্রহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে একসূত্রতা। এক হও। তোমার সাধনালব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বাণী শোন—এক হও। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শাসন, সমাজ, দেশ—ওসব অজের

ভূষণ। ওদের পরিত্যাগ করে নিজের নগ্নরূপ দেখ—সব মানুষ সমান। কিন্তু কে জানে? যদি না হয়? হয়তো এসব মিথ্যা—নইলে এত হিংসা কেন, এত দুঃখ কেন, মৃত্যু কেন—? না, না, আবার পথ হারিয়ে ফেলছি, আবার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—

"মা"—সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়ের গলা শোনা যায়, "কি রে?"

কল্যাণীর নিকট গিয়া দিলীপ উপস্থিত হইল।

"কি রে? আবার কি হল?"

"আমার মাথা আবার খারাপ হয়ে যাবে—তুমি আমায় আশ্রয় দাও মা—"

উমার প্রলাপ থামিয়াছে। সূর্যাতপে ক্লিষ্ট মৃণাল।

গোরা মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কল্যাণী জানালাব ধারে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া।

"মা—"

"আমার কাছে আয় বাবা—"

দিলীপ মায়ের নিকটে তাহার পদতলে বসিল।

কল্যাণী ছেলেব মাথায় হাত বুলাইল, খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, "দিলীপ—"

"এঁ্যা?"

"প্রমথ আজ ফিরে এসেছিল—" (শেখর শেখর শেখর—আমি মা, অথচ কাঁদছি না কেন?)

"তাই নাকি? কোথায়?"

"জেলে। আবার তাকে ধরে নিয়ে গেছে।" (লোহার শিকল একদিন ভেঙে পড়বে আপনা থেকেই।)

দিলীপ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে বেদনা।

"আরও খবর আছে বাবা—" (রক্ত! রক্ত! আমার নিজের বুকের রক্ত!)

"আর কি মা?" ভীত প্রশ্ন।

"শেখর খুন হয়েছে। (আমার ছেলে—আমার ছেলে—কাঁদব?) আমায় কাল সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাস, ওকে শেষবারের মতো দেখব—" (আমার অগণন সন্তানের রক্ত পড়ছে—আমি কাঁদব?)

দিলীপের চক্ষু বিস্ফারিত, সে চমকিয়া, ব্যথায় নিবর্ণ ও মুহ্যমান হইয়া বলিল—"মা—"

কল্যাণী ঠোঁটে আঙুল রাখিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "চুপ—চুপ, কথা বলিস নি। আমি কাঁদতে চেয়েছিলাম, প্রমথ নিষেধ করে গেছে। সেই ভালো, আমার চোখের জল বুকের মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলছে। সে আগুন একদিন ওদের পুড়িয়ে মারবে—যাদের জন্য আমার ছেলের প্রাণ গেছে, যাদের জন্য আমার ছেলে কারাপ্রাচীরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। চুপ—একটিও কথা বলিস নি বাবা—"

"মা"—দিলীপের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

"কি?"

"কি করব আজ বলে দাও।" (পাহাড় চূর্ণ করব? সমুদ্র শোষণ করব—)

"সকলকে এবার উঠে দাঁড়াতে বলবি। যত সব বঞ্চিত, দরিদ্র, পরাধীনের বুকে আগুন জ্বালবি—তোর সাধনা এই।"

"যদি না পারি?" (কেন পারব না? পারব—পারব—)

"ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ।"

"ঈশ্বর কি আছে মা?"

"আছে।"

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া গলির মধ্যস্থিত কোনও বাড়ি হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। কোনও শিশুর জন্ম হইয়াছে।

"ওকি মা? (সৈনিকেরা সমবেত—শঙ্খধ্বনি হয়েছে—যুদ্ধ কর—)

"আগামী কাল—তার জন্ম হল। তোরা কাজ করে যা বাবা—তোদের জন্ম তো কর্মের জন্য। তোরা না পারলে ওরা করবে—ভয় কি।"

দিলীপ মাথা নাড়িল, "তাই হবে মা, তাই হবে। আজ থেকে আর ভয়

নয়, সংশয় নয়, ভাবনা নয়—শুধু কর্ত্তব্য। ঘুরিয়ে দেব—সভ্যতার মোড়' ঘুরিয়ে দেব—আর ভয় করি না—"'

নিঃশব্দতা।

সেই রিক্ত কক্ষে, ময়লা হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোকে মাতা পুত্রের মুখ দেখা যায়। স্থির ও জ্বলন্ত তাহাদের দৃষ্টি। নিশ্চল তাহাদের দেহ। তাহাদের অন্তরের জ্বালাময় অগ্নিস্রোতে ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা।

বাহিরেও নিঃশব্দতা।

রাত্রি গভীরতম হইয়াছে। উপরে রহস্যময় কালো আকাশে নক্ষত্রের ক্ষীণ দ্যুতি। সুপ্ত মহানগরীর বসন, ভূষণ খসিয়া পড়িয়াছে, তাহাব প্রমোদ-গৃহের অবরুদ্ধ আলোকগুলি নিভিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে ভাসিয়া বেড়ায় কত অস্ফুট আর্ত্তনাদ, কত অস্পষ্ট কামনার মিছিল, কত হারাণো কথা, কত লঘুহাসি, কত তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস। নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে অতৃপ্ত আত্মার ব্যর্থ অভিসারের বিলাপ। রাত্রি গভীর হইয়াছে।

"উঃ বাইরে বড় অন্ধকার মা—"

"আর কতক্ষণ—এবার ভোর হবে।"

দিলীপ মায়ের দিকে চাহিল। হঠাৎ ক্ষীণ আলোতে একি রূপ মায়ের! মা যেন দুঃখিনী ভারতবর্ষ। সন্তানহারা, অভাবের নাগপাশে শৃঙ্খলিতা। মা, তোমায় প্রণাম করি।

বাহিরে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের ভয়ে অন্ধকার রাত্রি কাঁপিতেছে।